কতিপয় হারাম কাজ

যেগুলিকে মানুষেরা হালকা মনে করে

অথচ তা থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেকের ওয়াজিব

মূলঃ মুহাম্মাদ ছা-লিহ আল-মুনাজ্জিদ

অনুবাদ ও সংযোজনঃ
শাইখ আবুল কালাম আযাদ

KOTIPOY HARAM KAJ

Jeguloke Manushera Halka Mone Kore

কতিপয় হারাম কাজ

যেগুলোকে মানুষেরা হালকা মনে করে
অথচ তা থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেকের ওয়াজিব

মূলঃ মুহাম্মাদ ছা-লিহ আল-মুনাজ্জিদ

অনুবাদ ও সংযোজন ঃ

শাইখ আবুল কালাম আযাদ

(লিসান্স মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব)

প্রকাশনায় :

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল ঢাকা-১১০০০

কতিপয় হারাম কাজ

যেগুলোকে মানুষেরা হালকা মনে করে

প্রকাশনায় :

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

সূচীপত্র

অনুবাদকের কথাঃ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ.

অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা একমাত্র তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁরই কাছে ক্ষমা চাই, এবং আমাদের নাফসের মন্দ ও নোংরা আমল থেকে তাঁরই নিকট আশ্রয় কামনা করি। মহান আল্লাহ যাকে দ্বীনের হেদায়েত দান করেন– তাকে কেউ পথ ভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে হেদায়েত দানকারী আর কেউ থাকে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মহান আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার আর কোন উপাস্য নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোন শরীক নেই। আর আমি এটাও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) তাঁর বান্দাহ এবং তাঁর রাসূল।

ইসলামী শরীয়তে কোন কোন ভাল কাজের কী পরিমাণ ফযীলত? কী পরিমাণ সওয়াব দেয়া হবে? আর কী প্রতিদান দেয়া হবে? এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে এবং হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ঠিক এমনিভাবে কোন কোন নিষিদ্ধ বা হারাম কাজের জন্য কী পরিমাণ পাপ বা গুনাহ হবে, আর কী পরিমাণ তার শাস্তি দেয়া হবে? এ সমস্ত বিষয়েও কুরআন ও হাদীসে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তবে ইসলামী

শরীয়তে হারাম বা নিষিদ্ধ কার্যগুলো সম্পর্কে আলেম-উলামাদের পক্ষ থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী জোরালো বক্তব্য এবং প্রতিবাদ সম্বলিত লেখা বইয়ের সংখ্যা বাজারে খুবই নগণ্য।

বলা যেতে পারে যে, ভাল কাজের ফযীলত বর্ণনা করা আর ভাল কাজের নির্দেশ দেয়া এক হিসাবে সহজ। কিন্তু মানুষদেরকে হারাম এবং অন্যায় কাজ থেকে হুশিয়ার করা, বাধা দেয়া, অর্থাৎ অন্যায়ের প্রতিবাদ করা তুলনামূলক ভাবে অনেক ঝুঁকিপূর্ণ এবং বড় কঠিন কাজ। সেহেতু বর্তমান ধর্মীয় বইয়ের লাইব্রেরীগুলোতে খুব চাকচিক্য মলাটে, একেবারে চক্ষু জুড়ানো আকর্ষণীয় নাম করণে ফযীলতের এমন বহু বই-পুস্তক পাওয়া যায় যার অধিকাংশই মিথ্যা এবং কিচ্ছা-কাহিনীতে ভরপুর। কিন্তু হারাম বা নিষিদ্ধ কাজ হ'তে মানুষকে হুশিয়ার করা, বাধা দেয়া, এবং এ ব্যাপারে কড়া প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্পর্কে লিখিত বই-পুস্তক বাজারে খুব কমই পাওয়া যায়। তবে বিশেষ করে আমাদের বাংলা ভাষায় ইমাম শামসুদ্দীন 'আয-যাহাবীর আরবীতে লেখা 'কিতাবুল কাবায়ীর" বই (যা বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয়েছে) ব্যতীত বাংলা ভাষায় হারাম বা নিষিদ্ধ কার্যবলী সম্পর্কে দলীল ভিত্তিক নির্ভর যোগ্য আর কোন ভাল বই নযরে পড়ে না। সেহেতু ১৯৯৭ ইং সনে মদীনা ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয়ে পড়া অবস্থায় সাউদী আরবের এক বড় আলেম শায়খ আল মুনাজ্জিদ সাহেবের এ বই খানা হাতে পেয়ে এক নযরে বই খানা পড়ে অনুবাদ করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করি। কিন্তু পড়াশুনার কাজে অত্যধিক ব্যস্ত থাকার কারনে মদীনায় থাকা অবস্থায় বইটি অনুবাদ করা সম্ভব হয়নি। এরপর মদীনায় পড়া শেষ করে সাউদী আরবের রাজধানী রিয়াদে 'আস-সুলাই

ইসলামিক দা'ওয়া সেন্টার"-এ অনুবাদক এবং দাঈ হিসাবে চাকুরীতে যোগ দিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশী ও বাংলা ভাষী ভাইদের মাঝে কয়েক বছর দা'ওয়াতী কাজ করে মুসলিম সমাজে এই বইটির অতীব প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বইটির অনুবাদ কাজ শুরু করি। ইতিমধ্যে 'মাসিক আত-তাহরীক" পত্রিকায় পর্যায়ক্রমে কয়েক সংখ্যায় কুষ্টিয়ার বন্ধুবর মাওলানা আবদুল মালেক সাহেবের অনুবাদে পুরো বইটি প্রকাশিত হয়ে গেল। এভাবে এই একই বইয়ের আরো কয়েকটি অনুবাদ রিয়াদে থেকেই নযরে পড়েছিল।

অতীব প্রয়োজনের তাগিদে খুব তড়িঘড়ি করে এই বইটি অনুবাদ করতে গিয়ে 'মাসিক আত-তাহরীক" পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত কুষ্টিয়ার মাওলানা আবদুল মালেক ভাইয়ের অনুবাদের দ্বারা বিশেষভাবে সহযোগিতা গ্রহণ করি।

সত্যিকার অর্থে এভাবে সহযোগিতা না পেলে আরো বহু সময়ের প্রয়োজন হ'ত। অতএব আমার এ বই অনুবাদ এবং প্রকাশনার মাধ্যমে সদকায়ে জারিয়া হিসাবে যে সওয়াব অর্জিত হবে তার একটা বড় অংশ আবদুল মালেক ভাইয়ের প্রাপ্য- এতে কোন সন্দেহ নেই।

এ বইটি অনুবাদ করে প্রকাশ করার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই হলো ইসলামী শরীয়তের মাপকাঠিতে মুসলিম সমাজে অধিক প্রচলিত হারাম বা নিষিদ্ধ কার্যক্রম থেকে মুসলিম ভাই-বোনদেরকে হুশিয়ার করা, সর্তক করা। সেহেতু শায়েখ ছা-লেহ আল মুনাজ্জিদ সাহেবের উল্লিখিত বইয়ে আলোচ্য বিষয়াবলীর সাথে সম্পৃক্ত কুরআন ও হাদীস থেকে আরো প্রমাণ-পঞ্জি এবং বড় বড় মনীষীদের গবেষণালব্ধ আলোচনা সংযোজন করে

বইটির আলোচ্য বিষয়গুলোকে দলীল, প্রমাণ ও তথ্যে আরো সমৃদ্ধিশালী করার চেষ্টা করা হয়েছে।

যেমন মূল বইয়ে “শিরক”, “ধুমপানের বিধান”, “গান-বাজনা করা”, “টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা”, “দাড়ি কামানো”, “গীবতের বিবরণ” এ সমস্ত বিষয়গুলো মূল বইয়ে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা ছিল। আমি এ সমস্ত বিষয়গুলোকে কুরআন ও হাদীস এবং বিভিন্ন বিদ্বানগণের তথ্য থেকে আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। যাতে করে পাঠক সমাজ এ বইটা পড়ে তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশী উপকৃত হতে পারেন।

আমাদের দেশের অধিকাংশ স্বল্পশিক্ষিত পাঠক-পাঠিকা ভাই-বোনদের প্রতি বিশেষভাবে নযর রেখে এ বইয়ের ভাব-ভাষা খুবই সরল-সহজ ও প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। যাতে করে এন কোন শব্দ যেন পাঠক-পাঠিকার চোখের সামনে না পড়ে যে শব্দের অর্থ এবং ভাবার্থ বুঝতে তাদের কষ্ট হয়। আর এভাবে বইয়ের ভাষাকে সরল-সহজ করতে আমাকে কী পরিমাণ পরিশ্রম এবং সময় ব্যয় করতে হয়েছে সেটা কেবলমাত্র অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিরাই সহজে অনুমান করতে পারবেন।

এছাড় বইটি ছাপানোর ক্ষেত্রে অক্ষরগুলো তুলনামূলক ভাবে বড় করা হয়েছে যাতে পাঠক-পাঠিকা ভাই-বোনদের জন্য বইটি পাঠে কোন অসুবিধা না ঘটে।

একথা বাস্তব সত্য যে একটা বিল্ডিং তৈরী করে বসবাসের উপযুক্ত করতে যেমন শত শত মানুষের মেধা, শ্রম, ত্যাগ, সহযোগিতা এবং পরামর্শের প্রয়োজন হয় ঠিক তেমনি একজন

লেখক, অনুবাদক, গবেষক বা সাহিত্যিকের লেখনী বা সাহিত্যকর্ম বই আকারে পাঠক সমাজের হাতে তুলে দেয়ার জন্য বহু মানুষের মেধা, শ্রম, ত্যাগ, পরাপর্শ ও সহযোগিতার প্রয়োজন হয়।

জনাব রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে, “যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া আদায় করতে পারে না সে মহান আল্লাহরও শুকরিয়া আদায় করতে পারে না”।

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উল্লিখিত হাদীসের প্রতি নযর রেখে আমি সর্বপ্রথমে সেই মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি যিনি এই লিখনীর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনী খেদমতে আমার মত একজন নগণ্য এবং অযোগ্য মানুষকে অংশ গ্রহণ করার পূর্ণ তাওফীক দান করেছেন।

অতঃপর সাউদী আরবের রিয়াদ শহরে প্রতিষ্ঠিত “আস-সুলাই ইসলামিক দা'ওয়া সেন্টার” কর্তৃপক্ষের শুকরিয়া আদায় করি- যারা এই গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি খেদমত করার জন্য উপযুক্ত সময় ও সুযোগ করে দিয়েছেন। এমনিভাবে কুষ্টিয়ার বন্ধুবর মাওলানা আবদুল মালেক সাহেবের যথাযোগ্য শুকরিয়া আদায় করি যার অনুবাদের দ্বারা এই অনুবাদ কার্যে বিশেষভাবে সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়েছে।

এমনিভাবে সাউদী আরবের রাজধানী রিয়াদ শহরে “রাব'ওয়া ইসলামিক দা'ওয়া সেন্টার”-এর বাংলা বিভাগের অনুবাদক ও দাঈ ১. মাওলানা যাকের হুসাইন আল মাদানী (পশ্চিম বাংলা)। এমনিভাবে রিয়াদের “ছানাঈয়াজাদীদা ইসলামী দা'ওয়া সেন্টারের অনুবাদক ও দাঈ ২. মাওলানা আজমাল হুসাইন (সিলেটী)। এমনিভাবে ঢাকা বংশালের তাওহীদ

পাবলিকেশন্স'র মালিক মাওলানা ওয়ালীউল্লাহ সাহেবের শ্রদ্ধেয় পিতা ৩. আলহাজ অধ্যাপক মুযাম্মিল হক সাহেব।

উল্লিখিত তিন জন বিজ্ঞ আলেম এ বইয়ের অনুবাদ এবং বাংলা ও আরবী ভাষাগত ভুল-ত্রুটি শুধরিয়ে দিয়ে সম্পাদনার কাজে বিশেষভাবে সহযোগিতা করছেন। আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাদের প্রত্যেকের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। এরপর ঢাকা বংশালের "তাওহীদ পাবলিকেশন্স"-এর মালিক মাওলানা ওয়ালীউল্লাহসহ তার সকল সহযোগী কম্পোজিটার, মুদ্রক ও বাইন্ডার সকলের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

হে আল্লাহ! আমাদের সকলের শ্রমকে কবুল করুন এবং এই বই-এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। হে আল্লাহ! তুমি আমার পিতা-মাতা, সকল শিক্ষাগুরুসহ জীবিত ও মৃত সকল মুসলিম ভাই- বোনদেরকে ক্ষমা করে তাদের সকলকে জান্নাতুল ফিরদাউস নছীব করো। হে আল্লা! তুমি আমাদের সকলকে সে সমস্ত কাজ করার পূর্ণ তাওফীক দান করো- যে সমস্ত কাজ তুমি পছন্দ করো আর যে সমস্ত কাজে তুমি রাযী থাকো। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর পরিবার-পরিজন এবং তাঁর সমস্ত ছাহাবাদের প্রতি রহমত নাযেল করো- আমীন!

ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাগণের উপরে এমন কিছু জিনিস ফরয করে দিয়েছেন, যা পরিত্যাগ করা জায়েয নয়। এমনিভাবে তিনি কিছু সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যা অতিক্রম করা বৈধ নয় আর তিনি এমন কিছু জিনিস হারাম করে দিয়েছেন, যার ধারে কাছে যাওয়াও ঠিক নয়। এ মর্মে নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"مَاأَحَلَّ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ فَهُوَ حَلاَلٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ, فَاقْبَلُوْا مِنَ اللهِ الْعَافِيَةَ, فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَ مَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾(مريم:٦٤)

অর্থঃ "আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে যা কিছু হালাল করে দিয়েছেন তা হালাল, যা হারাম করেছেন তা হারাম, আর যে বিষয়ে তিনি নীরব থেকেছেন তা ক্ষমাইর যোগ্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমাকে গ্রহণ কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা ভুলে যাননা"। তারপর রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এ আয়াত পড়েন। "তোমার প্রতিপালক ভুলে যান না" (মারিয়াম,৬৪)। (হাকিম ২/৩৭৫ পৃঃ, শায়খ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) একে হাসান বলেছেন, গায়াতুল মারাম পৃঃ ১৪)।

এই হারাম সমূহই মহান আল্লাহর সীমারেখা।

যেমন তিনি বলেন,

﴿تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوْهَا﴾ (البقرة:١٨٧)

অর্থঃ "এ সব মহান আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং তোমরা এগুলোর নিকটেও যেয়ো না" (বাক্বারাহ, ১৮৭)। আল্লাহর

নির্ধারিত সীমালংঘনকারী ও হারাম অবলম্বনকারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভর্ৎসনা করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ (النساء:١٤)

অর্থঃ "যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশের অবাধ্যতা করে এবং তাঁর সীমারেখাসমূহ লংঘন করে– আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাবেন। তথায় সে চিরস্থায়ী থাকবে আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাময় শাস্তি" (আন-নিসা,১৪)। আর এ জন্যেই হারাম কাজসমূহ থেকে বিরত থাকা ফরয। কেননা রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"مَانَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوْا مِنْهُ مَااسْتَطَعْتُمْ" (مسلم)

অর্থঃ "আমি তোমাদিগকে যা কিছু নিষেধ করি তোমরা সে সব থেকে বিরত থাক। আর যা কিছু আদেশ করি তা যথাসাধ্য পালন কর"(মুসলিম)।

লক্ষ্যণীয় যে, বর্তমান সমাজে প্রবৃত্তি পূজারী, দুর্বলমনা ও স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী কিছু লোক যখন একসঙ্গে কিছু হারামের কথা শুনতে পায় তখন তারা আঁতকে উঠে, আর হা হা করতে থাকে। তখন তারা বলতে থাকে, আরে সবই তো হারাম হয়ে গেল। তোমরা তো দেখছি আমাদের জন্যে হারাম ছাড়া আর কিছুই বাকী রাখলেনা। তোমরা আমাদের জীবনটাকে সংকীর্ণ করে দিলে, মনটাকে বিষিয়ে দিলে! জীবনটা একেবারেই মাটি হয়ে গেল। কোন কিছুর সাধ-আহ্লাদই আমরা ভোগ করতে পারলাম না। শুধু হারাম আর হারাম ফৎওয়া দেয়া ছাড়া তোমাদের দেখছি আর কোন কাজ নেই। অথচ আল্লাহর দ্বীন

সহজ-সরল। তিনি নিজেও ক্ষমাশীল। আর শরী'আতের গণ্ডীও অনেক প্রশস্ত। সুতরাং হারামের সংখ্যা এতবেশী হ'তে পারে না। ঐ সমস্ত লোকদের জবাবে আমরা বলব, আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা তাই আদেশ করতে পারেন। তাঁর আদেশকে রদ করার মত আর কেউ নেই। এছাড়া মানুষের জন্য কোন্‌টা কল্যাণকর আর কোন্‌টা ক্ষতিকর এ সম্পর্কে একমাত্র তিনিই ভাল জানেন। অতএব তিনি যেটা বান্দার জন্য ভাল মনে করেছেন সেটাকে হালাল করেছেন আর যেটাকে খারাপ মনে করেছেন সেটাকে তিনি হারাম করে দিয়েছেন। তিনি পুত-পবিত্র। অতএব আল্লাহর দাস হিসাবে আমাদের করণীয় হবে–তাঁর সকল আদেশ ও নিষেধের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়া। কেননা তাঁর দেয়া যাবতীয় বিধানাবলী জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও ইনছাফ মুতাবিকই প্রকাশ পেয়েছে। সেগুলি নিরর্থক ও খেলনার বস্তু নয়। যেমন তিনি বলেছেন,

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (الأنعام : ١١٥)

অর্থঃ "তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য ও ন্যায়ের আলোকে পরিপূর্ণ হ'ল। তাঁর বাণীকে পরিবর্তনকারী আর কেউ নেই, আর তিনি সবকিছুই শুনেন আর সবকিছুই জানেন।" (আল-আন'আম, ১১৫)।

প্রকাশ থাকে যে, যে নিয়মের ভিত্তিতে হালাল ও হারাম নির্ধারণ করা হয়েছে– আল্লাহ তা'আলা তাও আমাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (الأعراف:١٥٧)

অর্থঃ "তিনি পবিত্র বস্তুকে তাদের জন্য হালাল আর অপবিত্র বস্তুকে তাদের উপর হারাম করে দিয়েছেন" (আল-আ'রাফ, ১৫৭)। সুতরাং যা পবিত্র তা হালাল আর যা অপবিত্র তা হারাম। আর কোন কিছুকে হালাল ও হারাম করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। কাজেই কোন মানুষ বা অন্য কেউ ঐ অধিকার নিজের জন্য দাবী করলে সে হবে একজন চরমপন্থী কাফির, ফলে সে নিঃসন্দেহে ইসলাম ধর্মের গণ্ডী হ'তে বেরিয়ে যাবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾

(الشورى:٢١)

অর্থঃ "তবে কি তাদের এমন সব উপাস্য রয়েছে, যারা তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে এমন সব বিধান দিয়েছে যার কোন অনুমতি আল্লাহ তা'আলা দেননি।" (আশ-শুরা, ২১)

প্রকৃতপক্ষে কুরআন ও হাদীছে পারদর্শী আলেমগণ ব্যতীত হালাল ও হারাম সম্পর্কে কথা বলার অধিকার অন্য কারো নেই। যে ব্যক্তি স্পষ্টভাবে জেনে শুনে হালাল ও হারাম সম্পর্কে কথা না বলে– কুরআন মাজীদে তার সম্পর্কে কঠোর হুশিয়ারবাণী উচ্চারিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ (النحل:١١٦)

অর্থঃ "তোমাদের জিহ্বায় মিথ্যা উচ্চারিত হয় বলে তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপের উদ্দেশ্যে এমনভাবে বলো না যে, এটা হালাল, ওটা হারাম।" (আন-নাহল, ১১৬)

যে সব বিষয় অখণ্ডনীয়ভাবে স্পষ্ট হারাম– তা কুরআন মাজীদে ও হাদীছে উল্লেখ আছে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ...﴾ (الأنعام:١٥١)

অর্থঃ (হে রাসূল! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)) আপনি বলুন, তোমরা এসো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর যা কিছু হারাম করে দিয়েছেন তা তোমাদেরকে পড়ে শুনাই। তোমরা তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না, তোমাদের মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ করবে আর দারিদ্রের কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। কেননা একমাত্র আমিই তো তোমাদের এবং তাদের সকলকেই রেযেক দিয়ে থাকি।" (আল-আনআম, ১৫১) অনুরূপভাবে হাদীছেও বহু হারাম জিনিসের বিবরণ এসেছে। যেমন রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ"

অর্থঃ "আল্লাহ তা'আলা মদ, মৃতপ্রাণী, শূকর ও মূর্তি কেনা-বেচা করা হারাম করে দিয়েছেন" (আবূদাউদ, হাদীছ ৩৪৮৬, হাদীছ ছহীহ, ইবনু বায (রাহিমাহুল্লা-হ))। অন্য হাদীছে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন

"إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ"

অর্থঃ "আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বস্তু হারাম করে দেন, তখন তার মূল্য তথা ঐ বস্তুর কেনা-বেচাও হারাম করে দেন" (দারাকুত্বনী, হাদীছ ছহীহ)।

কোন কোন আয়াতে কখনো একটি বিশেষ বিষয়ে হারামের আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়।

যেমন হারাম খাদ্যদ্রব্য প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ﴾ (المائدة:٣)

অর্থঃ "তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে-মৃতপ্রাণী, রক্ত, শূকরের গোশত, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবেহকৃত প্রাণী, গলা টিপে হত্যাকৃত প্রাণী, পাথরের আঘাতে নিহত প্রাণী, উপর থেকে নীচে পড়ে গিয়ে মৃত প্রাণী, কোন জানোয়ারের শিংএর আঘাতে মৃত প্রাণী, হিংস্র জানোয়ারের ভক্ষিত প্রাণী, অবশ্য (উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলিতে যে সব হালাল প্রাণীকে) তোমরা যবেহ করতে সক্ষম হও সে গুলি হারাম হবে না। আর (তোমাদের জন্য হারাম) সেই সব প্রাণী যেগুলি পূজার বেদীমূলে যবেহ করা হয় এবং ভাগ্য নির্ধারণকারী তীরের সাহায্যে যে গোশত তোমরা বণ্টন কর।" (আল-মায়েদা,৩)

হারাম বিবাহ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ (النساء:٢٣)

অর্থঃ "তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতৃকুল, কন্যাকুল, ভগ্নীকুল, ফুফুকুল, খালাকুল, ভ্রাতুষ্পুত্রীকুল, ভগ্নীকন্যাকুল, স্তন্যদাত্রীমাতৃকুল, স্তন্যপান সম্পর্কিত ভগ্নীকুল ও তোমাদের স্ত্রীদের মাতৃকুলকে।" (আন-নিসা, ২৩)

হারাম উপার্জন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة:١٧٥)

অর্থঃ "আল্লাহ তা'আলা কেনা ও বেচাকে হালাল করে দিয়েছেন আর সূদকে হারাম করে দিয়েছেন" (আল-বাক্বারাহ, ২৭৫)।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি খুবই দয়ালু। তিনি আমাদের জন্য শ্রেণীগতভাবে এমন অসংখ্য পবিত্র জিনিস হালাল করে দিয়েছেন-যা গুণে শেষ করা আদৌ সম্ভব নয়। এ কারণেই তিনি হালাল জিনিসগুলির বিস্তারিত বিবরণ দেননি। কিন্তু হারাম জিনিসগুলির সংখ্যা যেহেতু সীমিত এবং সেগুলি জানার পর মানুষ যেন তা থেকে বিরত থাকতে পারে সে জন্য তিনি সেগুলির বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ (الأنعام:١١٩)

অর্থঃ "তিনি তোমাদের উপর যা কিছু হারাম করে দিয়েছেন, তিনি তার বিস্তারিত বিবরণ তোমাদেরকে বলে দিয়েছেন। তবে তোমরা যে হারাম বস্তু একান্ত ঠেকায় পড়ে খেতে বাধ্য হও সেটা তোমাদের জন্য হালাল বা জায়েয।" (আল-আনআম, ১১৯) ইসলামী শরী'য়াতে হারাম বিষয়গুলিকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে আর হালাল বিষয়গুলিকে সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (البقرة:١٦٨)

অর্থঃ "হে মানবমণ্ডলী! যমীনের বুকে যা কিছু আছে তার মধ্য হ'তে হালাল ও পবিত্র জিনিসগুলি তোমরা খাও, আর তোমরা শয়তানের পথসমূহ অনুসরণ করো না, কেননা নিশ্চয়ই ঐ শয়তান তো, তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (আল-বাক্বারাহ,১৬৮) কোন বস্তু হারাম হওয়ার সুস্পষ্ট দলীল সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত সব জিনিসের মূল হুকুম হালাল হওয়াটা আমাদের উপর মহান আল্লাহর বড় অনুগ্রহ এবং তাঁর বান্দাদের প্রতি 'ইসলামী শরী'য়াতকে' সহজসাধ্য করার অন্যতম নিদর্শন। সুতরাং সেই মহান আল্লাহ তা'আলার যথাযথ আনুগত্য করা, প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করা আমাদের প্রত্যেকের একান্ত কর্তব্য।

কিন্তু পূর্বোল্লেখিত ঐ সব মানুষেরা যখন তাদের সামনে হারাম বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে দেখতে পায়–তখন তাদের মন সংকীর্ণতায় ভোগে। এটা তাদের ঈমানী দুর্বলতা ও শরী'য়াত সম্পর্কে অনুধাবন শক্তির স্বল্পতার ফসল। আসলে তারা চায় যে, হালাল বিষয় সমূহের শ্রেণীবিভাগগুলি তাদের সামনে এক এক করে বর্ণনা করা হোক– যাতে তারা ইসলামী শরী'য়াত যে একটা সহজ বিষয় তা জেনে তারা আত্মতৃপ্ত হ'তে পারে।

অতএব তারা কি চায় যে, নানা শ্রেণীর পবিত্র জিনিসগুলি তাদের সামনে এক এক করে তুলে ধরা হোক, যাতে তারা নিশ্চিত হ'তে পারে যে– ইসলামী শারী'য়াত তাদেরকে ধুম্রজালে করে দেয়নি। তারা কি চায় যে, এভাবে বলা হোক- উট, গরু, ছাগল, খরগোশ, হরিণ, পাহাড়ী ছাগল, মুরগী, কবুতর, হাঁস, রাজহাঁস ইত্যাদি যবেহকৃত প্রাণীর গোশত হালাল। মৃত পঙ্গপাল ও মাছ হালাল। শাক-সবজী, ফল-মূল, সকল দানা শস্য ও

উপকারী ফল-মূল হালাল। পানি, দুধ, মধু, তেল ও শিরকা হালাল। লবণ, মসলা ও ভাত হালাল।

লোহা,বালু, খোয়া, প্লাস্টিক, কাঁচ ও রাবার ইত্যাদি ব্যবহার করা হালাল।

খাট, চেয়ার, টেবিল, সোফা, আসবাবপত্র ইত্যাদি ব্যবহার করা হালাল।

জীব-জন্তু, মোটরগাড়ী, রেলগাড়ী, জাহাজ ও বিমানে আরোহণ করা হালাল।

এয়ারকণ্ডিশন, ফ্রিজ, ওয়াটার হিটার, পানি শুকানোর যন্ত্র, আটা পেষণ যন্ত্র, আটা খামির করার যন্ত্র, কীমা তৈরীর যন্ত্র, রস নিংড়ানো মেশিন, সবরকমের ডাক্তারী ও ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি ইত্যাদি হালাল।

সুতী, কাতান, পশম, নাইলন,পলেস্টার ও বৈধ চামড়ার তৈরী করা বস্ত্র হালাল।

বিবাহ, বেচা-কেনা, যিম্মাদারী, হাওলাকরণ, ইজারা বা ভাড়া দেয়া হালাল।

বিভিন্ন পেশা যেমন কাঠমিস্ত্রির কাজ, কর্মকারের কাজ, যন্ত্রপাতি মেরামত, ছাগল-গরু, উট-দুম্বা ও ভেড়া-মহিষ ইত্যাদির রাখালী করা হালাল।

এভাবে শুনলে আর বর্ণনা দিলে পাঠকের কি মনে হয় যে, আমরা হালালের বর্ণনা দিয়ে শেষ করতে পারব? তাহ'লে এসব লোকের অবস্থা কী? তারা যে কোন কথাই বুঝতে চায়না।

'ইসলামী শরী'য়াত' যে সহজ তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবুও এ কথা বলে যারা সব কিছুই হালাল প্রমাণ করতে চায় তাদের কথা সত্য– কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য খারাপ। কেননা ইসলামী বিধানের মধ্যে কোন কিছুই মানুষের মর্যি মুতাবিক সহজ হয়না। তা কেবল ইসলামী শরী'য়াতে যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেভাবেই পালন করতে হবে। অপর দিকে ইসলামী শরী'য়াত সহজ এরূপ বাতিল দলীল দিয়ে হারাম কাজ করা আর শরী'য়াতের অবকাশ মূলক দিক গ্রহণ করার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। শরী'য়াতে অবকাশ মূলক কাজের উদাহরণ যেমন- সফরে দু'ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া, ক্বছর করা, রোযা ভঙ্গ করা, মুক্বীমের জন্য একদিন একরাত আর মুসাফিরের জন্য ৩দিন ৩রাত পা ধোয়ার স্থলে মোযার উপর মাসেহ করা, পানি ব্যবহারের অসুবিধা থাকলে তায়াম্মুম করা, অসুস্থ হ'লে কিংবা বৃষ্টি নামলে দু'ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া, বিবাহের প্রস্তাবদাতার জন্য অনাত্মীয়া মহিলাকে দেখা, শপথের কাফফারায় দাস মুক্তি করা, মানুষকে আহার করান, বস্ত্র দান, রোযা পালনের যে কোন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইত্যাদি। ইসলামী শরী'য়াতে এসব অবকাশ কখনোই হারামকে প্রশ্রয় দেয়না– ফলে বর্ণিত শর্তের বাইরে যাওয়ার কোন সুযোগ এখানে নেই।

মোটকথা ইসলামী শরী'য়াতে যখন হারামের বিধান আছে তখন সকল মুসলমানের জন্যই তার মধ্যে যে গূঢ়-রহস্য বা তত্ত্ব লুকিয়ে আছে তা জানা একান্ত প্রয়োজন। যেমন–

**আল্লাহ তা'আলা 'হারাম' অর্থাৎ নিষিদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করে

থাকেন। বান্দারা এ সম্পর্কে কেমন আচরণ করে তা তিনি লক্ষ্য করে থাকেন।

**কে জান্নাতবাসী হবে, আর কে জাহান্নামবাসী হবে, এই হারাম ঘোষণার মাধ্যমে তা অতিসহজেই নির্ধারণ করা যায়। যারা জাহান্নামী হবে, তারা সর্বক্ষণ নিজ প্রবৃত্তির পূজায় মগ্ন থাকে যা দিয়ে জাহান্নামকে ঘিরে রাখা হয়েছে। আর যারা জান্নাতবাসী হবে, তারা দুঃখ-কষ্টে সর্বদা ধৈর্য ধারণ করে থাকে– যে দুঃখ-কষ্ট দিয়ে জান্নাতকে ঘিরে রাখা হয়েছে। মোটকথা এ পরীক্ষা না থাকলে কে সত্যিকারভাবে আল্লাহর আনুগত্যকারী আর কে আনুগত্যকারী নয় এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্য করা যেত না।

** যারা সত্যিকার ঈমানদার ও পরহেজগার তাদেরকে হারাম কাজগুলি পরিত্যাগ করতে যেয়ে যে কষ্ট সহ্য করতে হয়– সেই কষ্টকে তারা সাদরে বরণ করে নেয় পুণ্য লাভের আশায় এবং আল্লাহ তা'আলার যে কোন নির্দেশ পালনকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উপায় বলে মনে করে। ফলে কষ্ট স্বীকার করা তাদের পক্ষে সহজ হয়ে যায়। অপর পক্ষে যারা দুর্বল ঈমানদার, কপট ও মুনাফিক্ব তারা কষ্ট সহ্য করাকে সাক্ষাৎ যন্ত্রণা ও বেদনা বলে মনে করে। ফলে ইসলামের পথে পদচারণা তাদের পক্ষে কঠিন, আর সৎকাজ সম্পাদন করা ও আনুগত্য স্বীকার করা ততোধিক কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

**একজন সৎ লোক আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনার্থে হারাম কাজ পরিহার করলে বিনিময়ে যে উত্তম কিছু পাওয়া যায় তা ভালভাবেই অনুধাবন করতে পারে। এ ভাবে সে তার মনোরাজ্যে ঈমানের স্বাদ উপভোগ করতে পারে।

সম্মানিত পাঠক সমাজ! আলোচ্য পুস্তিকার মধ্যে ইসলামী শরী'য়াতে হারাম বলে ঘোষিত এমন কিছু সংখ্যক নিষিদ্ধ বিষয়ের বিবরণ পাবেন, যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দলীল সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। এ সব হারাম

কাজগুলি এমনই যা আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, আর বহু সংখ্যক মুসলমান তা নির্দ্বিধায় করে চলেছে। আমরা শুধুমাত্র মুসলিম উম্মার ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির উদ্দেশ্যে বহুল প্রচলিত ঐ সমস্ত হারাম কাজগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি।

মানুষেরা হারাম কাজ কেন করে?

বর্তমান বিশ্বে বসবাসকারী যারা অমুসলিম যেমন- কাফের, ইহুদী খৃস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি.....তারা সকলেই ইসলাম কবূল না করার কারণে তাদের পরকালীন জীবনে চিরস্থায়ী ঠিকানা হবে 'জাহান্নাম' যেখানে অবর্ণনীয় বিভিন্ন ধরণের কঠিন শাস্তি অনন্তকাল ধরে তাদেরকে ভোগ করতে হবে। অপর দিকে যারা মুসলমান তারা ইসলাম কবূল করার কারণে এবং সেই সাথে সাথে মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সকল আদেশ-নিষেদ যথাযথভাবে মেনে চলার কারণে তাদের পরকালীন জীবনে চিরস্থায়ী ঠিকানা হবে 'জান্নাত' যেখানে মু'মিন বান্দাদের চক্ষু শীতলকারী এমন সব জিনিসপত্রের দ্বারা (যেমন পানীয় দ্রব্য, খাদ্য দ্রব্য, আরাম-আয়েশের জন্য বিভিন্ন প্রকার বস্তু) সাজানো থাকবে যা কোন চোখ কোনদিন দেখেনি। যা কোন কান কোন দিন শোনেনি। আর মানুষের কোন অন্তরও সে বিষয়ে কোন কল্পনাও করতে পারবে না। তা'হলে স্বচেতন ঈমানদার এবং মুসলমান ভাইকের জন্য এটা উচিত ছিল যে, মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সকল নির্দেশ পালন করা অর্থাৎ যথাযথভাবে ইবাদাত-বন্দেগী করা। অপর দিকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নিষেধকৃত সকল প্রকার হারামা কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার উদ্দেশ্যে প্রথমে নিজের নফসের সাথে এরপর সমাজের দুর্নীতি বাজ, দুস্কৃতিকারী ও পাপাচারী লোকদের সাথে প্রয়োজনে প্রতিবাদ ও সংগ্রাম চালিয়ে পরকালীন জীবনে জান্নাত লাভের উদগ্র আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা নিয়ে পথিকের পান্থশালার মত এ ক্ষণস্থায়ী জগতে পরিবার-পরিজন তথা সকলকে নিয়ে সাধ্যানুযায়ী শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা

চালিয়ে যাওয়া কিন্তু আজ বর্তমান বিশ্বে অবস্থানকারী তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী অধিকাংশ মুসলমান তারা কেন মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ অমান্য করে? অর্থাৎ তারা যথাযথভাবে ইবাদত-বন্দেগী না করে বরং দুর্বার গতিতে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানীর অর্থাৎ ইসলামী শরীয়তে নিষেধকৃত যতসব হারাম কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ছে। এর কারণ কী? এর অন্যতম কারণ একটি। সেটা হলো 'ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব' যেমন :

১. মহান আল্লাহ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান না থাকা। যেমন আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব, কুদরত, গুণাবলী, অপরিসীম ক্ষমতা এবং তাঁর পরিচিতি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান না থাকা।

২. আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু 'আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান না থাকা। কেননা একজন মানুষের জীবনে তার ইবাদাত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে এবং দুনিয়ায় বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষের সাথে আচার-ব্যবহার, লেন-দেন তথা দুনিয়াবী সর্ব ক্ষেত্রে একমাত্র, শুধুমাত্র অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় যিনি হবেন– তিনি হলেন; জান্নাতী পথের দিক-নির্দেশনাকারী, জাহান্নামের শাস্তি থেকে মানুষকে সতর্ককারী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের প্রতীক আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু 'আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম)।

৩. পবিত্র কুরআন মাজীদ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান না থাকা। কেননা দুনিয়ার মানুষকে জান্নাতের পথ দেখানোর জন্য এবং ক্ববরের ও জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে সর্তক করার জন্য মহান আল্লাহর তরফ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ হলো "পবিত্র কুরআন" অথচ বর্তমান কুরআন মাজীদের সাথে

অধিকাংশ মুসলমানের কোন সম্পর্ক নেই। যার ফলে অধিকাংশ মানুষ হিদায়েতের পথ থেকে দূরে সরে গিয়ে গুমরাহী তথা হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে জাহান্নামীদের পথে দুর্বারগতিতে ধাবিত হচ্ছে।

৪. মহান আল্লাহ কী উদ্দেশ্যে মানুষ জাতিকে সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন? এ সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষের কোন চিন্তা-ভাবনা না করা বা কোন সঠিক ধারণা না থাকা।

৫. সৃষ্টি জগত সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনা বা গবেষণা না করা। অর্থাৎ এ আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহ, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, গাছ-পালা, তৃনলতা, পশু-পাখী, জীব-জানোয়ার এসব কিছুই মহান আল্লাহ কেন সৃষ্টি করলেন? কাদের জন্যে সৃষ্টি করলেন? এ সমস্ত বিষয়ে অধিকাংশ দুনিয়াদার মানুষেরা, ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জাহেল মানুষেরা আর যারা জাহান্নামী হবে তারা একটু চিন্তা-ভাবনা করে দেখে না – বরং তারা লাগামহীন ভাবে মনে যা চায় সেটাই করে দুনিয়ার স্বাদ গ্রহণ করে চলেছে।

৬. মানুষের জন্য মহান আল্লাহর দেয়া হাজার-হাজার, লাখো, লাখো নি'য়ামত ভোগ করে যথাযথভাবে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় না করা।

৭. ইসলামী শরীয়তের আলোকে ভাল ভাল কাজ বা অত্যাধিক সওয়াবের কাজ কোনগুলো? আর ঐ সমস্ত ভাল কাজের প্রতিদান বা সওয়াব কী দেয়া হবে? কখন দেয়া হবে? এ সম্পর্কে সঠিক কোন জ্ঞান না থাকা।

৮. কোন কোন কাজগুলো নিষিদ্ধ তথা হারাম। আর ঐ হারাম কাজগুলোর পরিণতি বা শাস্তি কী হবে। এ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান না থাকা।

৯. ইহূদী, খৃস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ তথা অন্যান্য ধর্ম ব্যতীত একমাত্র ইসলাম ধর্মই মহান আল্লাহর নিকট মনোনীত ধর্ম কেন? এই ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কী? এ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান না থাকা।

১০. ছাগল-ভেড়া-দুম্বা, গরু-মহিশ-উট, হাতী-ঘোড়া-গণ্ডার, বাঘ-ভাল্লুক-শিয়াল ইত্যাদি...এসমস্ত প্রাণী জাতির উপর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষ জাতিকে কেন এবং কী কারণে প্রাধাণ্য দিয়েছেন? সৃষ্টির সেরা জাতি হিসেবে মানুষকে কেন মর্যদা দিয়েছেন? ঐ সমস্ত জানোয়ার থেকে কাল কিয়ামতের মাঠে মহান আল্লাহ কোন হিসাব নিবেন না কেন? আর ঐ সমসস্ত প্রাণীর জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাত ও জাহান্নামের ব্যবস্থা কেন করেননি?

অপর দিকে আল্লাহ তা'আলা কাল কিয়ামতের মাঠে প্রত্যেক নারী-পুরুষ তথা প্রত্যেক মানুষের নিকট থেকে ৫টি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না নেয়া পর্যন্ত কাউকে সামনে এক পা অগ্রসর হতে দিবেন না কেন?

ঐ ৫টি প্রশ্ন নিম্নরূপ

ক. তুমি তোমার সারাটি জীবন কিভাবে কাটিয়েছ?

খ. তুমি তোমর যৌবন কালটাকে কোথায় এবং কিভাবে কাজে লাগিয়েছ?

গ. তুমি তোমার উপার্জিত ধন-সম্পদ যেমন, টাকা-পয়সা, ব্যাংক-ব্যালেন্স, জমা-জমি, বাড়ী-গাড়ী ইত্যাদি...কোন পথে এবং কিভাবে উপার্জন করছে?

ঘ, তুমি তোমার উপার্জিত টাকা-পয়সা, ধন দৌলত দুনিয়ায় কোন পথে, কিভাবে? এবং কাকে খুশী করার জন্য খরচ করেছিলে?

ঙ. তোমাকে যে পরিমাণ জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি দেয়া হয়েছিল সেই জ্ঞান-বুদ্ধি খাটিয়ে দুনিয়ায় কী পরিমাণ ভালকাজ তুমি করেছিলে?

এ ৫টি প্রশ্নসহ উপরের বিষয়গুলো সম্পর্কে যারা চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে মহান আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য অনুধাবন করার চেষ্টা করে- কেবল তারাই আল্লাহকে ভয় করে এবং পরকালে জাহান্নামের কঠিন শাস্তিকে ভয় করে অন্যায় ও হারাম কার্যক্রম থেকে সাধ্যানুযায়ী বিরত থাকার চেষ্টা করে। অপরদিকে যারা আল্লাহর সৃষ্টি এবং তার অগণিত অসংখ্য নিয়ামত সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে না তাদের অধিকাংশই আল্লাহকে ভয় করে না। আর জাহান্নামের শাস্তিকেও তারা ভয় করে না। যার ফলে তারা লাগামহীনভাবে এবং দ্বিধাহীন চিত্তে অন্যায় ও হারাম কার্যক্রম করতেই থাকে।

১১. কি জন্য এবং কোন কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে মহান আল্লাহ পুরুষদেরকে নারীদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান না থাকা।

১২. শয়তানের অনুসরণ করা। যেমন শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে, নফসের গোলামী করতে যেয়ে আল্লাহর দুশমন ইয়াহূদী-খৃস্টানদের তৈরী করা বিভিন্ন ফিৎনা ফাসাদের জালে বন্দী হয়ে

ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাশ ও চাকচিক্যে মাতোয়ারা হয়ে উঠা।

অপর দিকে মৃত্যুর পরে ক্ববরে এবং হাশরের ময়দানে সারাটি জীবনের কড়ায় ক্রান্তিতে হিসাব দিতে হবে– এ সম্পর্কে কোন চিন্তা বা অনুভূতি না থাকা।

১৩. আল্লাহর গোলামী ছেড়ে দিয়ে নিজের নফসের এবং শয়তানের গোলামী করা। কেননা দুনিয়ার জীবনে রুযী রোযগার করার জন্য, আরাম-আয়শে এবং ভোগ-বিলাশে জীবন অতিবাহিত করার জন্যে দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে দুর্বার গতিতে সামনের দিকে ছুটে চলেছে– যেমন পিছন ফিরে তাকানোর সময় তাদের নেই। তাদের অবস্থা দেখলে মনে হয় যে- তারা মহান আল্লাহর গোলামী বা দাসত্ব ছেড়ে দিয়ে দুনিয়ায় নফসের তথা শয়তানের দাসত্ব শুরু করেছে।

১৪. মৃত্যুর এবং ক্ববরের আযাব সম্পর্কে যথাযথ ভয় ও অনুভূতি না থাকা। কেননা বর্তমান যুগে অধিকাংশ মানুষের প্রতি নযর করলে দেখা যায় যে– অধিকাংশ মানুষ দুনিয়ার পিছনে একেবারে মত্ত-মাতাল হয়ে ছুটছে আর ছুটছে। হঠাৎ কবে কার কোন দিন মৃত্যু ঘণ্টা বেজে উঠবে– যার ফলে জীবনের সমস্ত আশা-আক্তক্ষাখা ও বাসনা মুহূর্তের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। টাকা-পয়সা, ব্যাংক ব্যালেন্স, বাড়ী-গাড়ী, জমা-জমি, ব্যবসা-বাণিজ্য সব কিছুই পড়ে রবে। ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন তথা পরিবার-পরিজন সকলকেই ছেড়ে, সকলের মায়া ছিন্ন করে একাকী ক্ববরে যেতে হবে। আর যথাযথ নেক আমল না থাকলে সেই অন্ধকার ক্ববরের কঠিন আযাব ভোগ করতে হবে। এমনিভাবে কিয়ামতের মাঠে এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামে অনন্তকাল

ধরে অবর্ণনীয় আযাব ভোগ করতে হবে। এ সমস্ত বিষয়ে বর্তমান অধিকাংশ মানুষের কোন ভয় ভীতি এবং কোন অনুভূতিই নেই।

পরশেষে আমরা এ কথা বলতে পারি যে– অবশ্যই উল্লিখিত ১৪টি বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান না থাকার কারণে, আর ঐ সমস্ত বিষয়ে যথাযথভাবে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে সঠিক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ না করা এবং যথাযথভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করার কারণে অধিকাংশ মানুষ আজ দুর্বার গতিতে পাপের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

অতএব আমরা যারা মৃত্যুর যন্ত্রণা হ'তে, ক্ববরের বিভিন্ন রকম শাস্তি হ'তে, কিয়ামত মাঠের ভয়ঙ্কর আযাব সমূহ হ'তে এবং জাহান্নামের চিরস্থায়ী অবর্ণনীয় কঠিন শাস্তিসমূহ হ'তে মুক্তি পেয়ে পরকালীন জীবনে মু'মিন বান্দাদের জন্য চিরস্থায়ী শান্তির স্থান জান্নাত পেয়ে ধন্য হ'তে চাই- তারা যেন উল্লিখিত ১৪টি বিষয়ে যথাযথভাবে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষনা করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে এই বইয়ে বর্ণিত সকল প্রকার হারাম কাজগুলো থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে পারি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে এ ব্যাপারে পূর্ণ তাওফীক দান কর–আমীন!

১. আল্লাহর সাথে শিরক করা (اَلشِّرْكُ بِاللهِ)

"আল্লাহর সাথে শিরক করা" অর্থাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করা– যে কোন বিচারে সবচেয়ে বড় হারাম ও মহাপাপ। এ বিষয়ে "পবিত্র কুরআন" ও "ছহীহ হাদীছ" থেকে বহু দলীল বর্ণিত হয়েছে যার কিছু অংশ ধারাবাহিকভাবে নিম্নে বর্ণনা করা হবে ইনশা'আল্লাহ।

(١) عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : " أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ (ثَلَاثًا) قَالُوْا قُلْنَا بَلَى يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ ..."

অর্থঃ "আবূ-বাকরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কাবীরা গোনাহগুলি সম্পর্কে খবর দিব না? (এ কথাটি রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) ছাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে ৩বার বলেছিলেন)। উত্তরে ছাহাবীরা বলেছিলেন, তখন আমরা সবাই বলে উঠলাম যে, হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আপনি আমাদেরকে উক্ত বিষয়ে খবর দিন। তখন রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বললেন, "আল্লাহর সাথে শিরক করা..." (বুখারী ও মুসলিম)।

মহান আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে একমাত্র শিরকের গোনাহ ছাড়া মানুষের সমস্ত গোনাহ-খাতা তাওবাহ ছাড়াই মাফ

করে দিতে পারেন। আর শিরকের গোনাহ বিশেষভাবে তওবা করা ছাড়া কোন রকমেই আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيْدًا﴾ (النساء:١١٦)

অর্থঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে কৃত শিরকের গোনাহ মাফ করবেন না। এই শিরকের গোনাহ ছাড়া আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার জীবনের সমস্ত গোনাহ-খাতা (তওবাহ ছাড়াই) মাফ করে দিবেন, আর যে আল্লাহর সাথে শিরক করবে– সে অবশ্যই ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হবে" (আন-নিসা, ৪৮)।

যখন কোন মানুষ বড় শিরক করে, তখন সে ইসলাম ধর্মের গণ্ডি হ'তে একেবারে বের হয়ে যায়। আর সে যদি ঐ অবস্থায় তাওবাহ ছাড়াই মারা যায়– তাহ'লে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। বহু মুসলিম দেশে সম্প্রসারিত কয়েকটি বড় বড় শির্কী কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

২. ক্ববর পূজা (عِبَادَةُ الْقُبُوْرِ)

ক্ববর পূজা হলোঃ মনেপ্রাণে এ বিশ্বাস করা যে, ক্ববরে শায়িত আল্লাহর প্রিয় ও নেককার মৃত বান্দারা দুনিয়ার মানুষের সকল আবেদন-নিবেদন শুনতে পায়, সকল প্রকার প্রয়োজন মিটাতে পারে, সকল প্রকার বিপদ-আপদ দূর করতে পারে, পরকালে তারা তাদের মুরিদান ও ভক্তদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে... ইত্যাদি ধারণা ও বিশ্বাস নিয়ে তাদের কাছে সাহায্য ও সহযোগিতা চাওয়া, তাদের

কাছে ফরিয়াদ করা, তাদের নামে মানত ও নযর নিয়ায মানা এবং তাদের ক্বর তাওয়াফ করা... ইত্যাদি কার্যক্রমকে ছওয়াবের কাজ মনে করাই হলো ক্বর পূজা যা পরিষ্কার শিরক তথা হারাম। অথচ মহান আল্লাহ মানুষদেরকে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার এবং একমাত্র তাঁরই কাছে সাহায্য চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا﴾ (الإسراء:٢٣)

অর্থঃ "(হে মুহাম্মাদ! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)) আপনার প্রতিপালক এটাই নির্দেশ দিয়েছেন যে, "তোমরা একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, আর পিতা-মাতার মধ্য হ'তে কোন একজন অথবা দু'জনই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হ'লে তাঁদের শানে 'উফ' শব্দটিও বলবে না, আর তাঁদেরকে কোন প্রকার ধমকও দিবে না, বরং তাঁদের সাথে (সদা-সর্বদা) নরম ভাষায় সম্মানসূচক কথা বলবে" (আল-ইসরা,২৩)। তিনি আরো বলেছেন,

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ﴾ (الفاتحة:٤)

অর্থঃ "(হে আল্লাহ!) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি, আর একমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি" (আল-ফাতিহা,৫)।

এমনিভাবে পরকালীন জীবনে সুপারিশ পাওয়ার আশায় এবং সকল প্রকার বিপদ-আপদ ও কাঠিন্যতা হ'তে মুক্তি পাওয়ার আশায় আল্লাহর প্রেরিত নাবী ও রাসূলগণ এবং

আল্লাহর প্রিয় ও নেককার বান্দাগণ যারা মৃত্যু বরণ করেছেন, সরাসরি তাঁদের কাছে দু'আ করা বা তাঁদের ওয়াসীলা করে আল্লাহর কাছে দু'আ ও প্রার্থনা করাও ক্বর পূজা ও শির্কের শামিল। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿أَمَّنْ يُجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللهِ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ﴾ (النمل:٦٢)

অর্থঃ "বলো তো! কে অসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে? আর কে তার কষ্ট দূরীভূত করেন এবং কে তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন? অতএব আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা উপদেশ খুব কমই গ্রহণ করে থাক।" (আন-নামল,৬২)

অনেক ক্বর ও পীর পূজারীরা কঠিন বিপদ মুহূর্তে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাদের পীর সাহেবদের নাম স্মরণ করে থাকে এবং বিপদ থেকে মুক্তির জন্য তাদের কাছে দু'আ করে থাকে। যেমন নদীমাতৃক বাংলাদেশে বিশেষ করে চৈত্র ও বৈশাখ মাসে প্রচণ্ড ঝড় ও টর্নেডোর কবলে পড়ে অধিকাংশ মাঝি মাল্লারা নৌকা, লঞ্চ ও জাহাজ ডুবির হাত থেকে বাঁচার জন্য, আর অনেকে কঠিন বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, আর অনেকেই অভ্যাসগতভাবে উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে, এমনকি পথে চলার সময়ে পায়ে হোঁচট খেয়ে তারা তাদের পীর-মুর্শীদ ও ভক্তিভাজনদের নাম স্মরণ করে এভাবে বলতে থাকে যে– ইয়া মুহাম্মাদ, ইয়া আলী, ইয়া হুসাইন, ইয়া আব্দুল ক্বাদের জীলানী, ইয়া খাজা মায়নুদ্দীন চিশ্‌তী, ইয়া খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া, ইয়া বাবা শাহজালাল, ইয়া বাবা মাইজ ভাণ্ডারী, ইয়া বাবা আয়নাল কারীগর, ইয়া বাবা কিল্লা শাহ্, ইয়া বাবা

সাঈদাবাদী, ইয়া বাবা আটরশী... । ঐ সমস্ত গায়রুল্লার পূজারী অর্থাৎ দেব-দেবী, মূর্তি, ক্ববর ও পীর পূজারীদেরকে লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِن دُوْنِ اللهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ﴾ (الأعراف:١٩٤)

অর্থঃ "নিশ্চয় তোমরা মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে আর যাদেরকে ডাক– তারা তো তোমাদের মতই আল্লাহর সৃষ্ট বান্দা। যদি তোমাদের দাবীতে তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক; তাহ'লে তোমরা তাদেরকে ডাক, আর তারা তোমাদের সেই ডাকে সাড়া দিক।" (আল-আ'রাফ, ১৯৪)

মহান আল্লাহ ঐ সমস্ত বাতেল ও ভিত্তিহীন উপাস্যদের চরম-পরম দুর্বলতার বর্ণনা দেওয়ার জন্য সুন্দর একটা দৃষ্টান্ত পেশ করতে যেয়ে বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَلَوِاجْتَمَعُوْا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ﴾ (الحج:٧٣)

অর্থঃ "হে মানব মণ্ডলী! একটা দৃষ্টান্ত পেশ করা হ'ল– তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শোন। তোমরা মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে আর যাদেরকে ডাকছ; নিশ্চয়ই তারা তো সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কখনও একটা মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না। (শুধু তাই নয়, তারা এতই দুর্বল যে) যদি সামান্য একটা মাছি তাদের নিকট থেকে কোন কিছু ছিনিয়েও নিয়ে যায়– তবুও তারা ঐ সামান্য মাছির নিকট হতে ঐ ক্ষুদ্র জিনিসটিও উদ্ধার করতে পারবে না। কেননা গায়রুল্লাহর কাছে আবেদনকারী ঐ সমস্ত

মানুষেরা অপরদিকে ঐ সমস্ত গায়রুল্লাহ যাদের কাছে আবেদন জানানো হচ্ছে তারা দুজনই তো খুবই দুর্বল" (সূরা-হাজ্জ,৭৩)।

গাইরুল্লার পূজারীদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوْ مِن دُوْنِ اللهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ﴾ (الأحقاف:٥)

অর্থঃ ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক পথ ভ্রষ্ট আর কে হ'তে পারে? "যে মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকোন সৃষ্ট বস্তু বা মানুষকে ডাকে– যে ক্বিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবে না, আর তারা তো আহ্বান কারীদের আহ্বান সম্পর্কে কিছুই খবর রাখে না।" (আল-আহকাফ, ৫)

অনেক ক্ববর ও পীর পূজারী তাদের পীর সাহেবদের ও তথা কথিত নামধারী ওয়ালি-আওলিয়াদের ক্ববরে যেয়ে ক্ববরের চারিপার্শ্বে তাওয়াফ করে, হাত দ্বারা ক্ববরকে স্পর্শ করে ও সেই হাত কপালে, মুখে ও বুকে ঘঁষে। আর অনেকেই ক্ববরের ইট, পাথর বা কাঠের উপরে চুমা দেয় ও সেখানে মুখমণ্ডল ঘষে। আর অনেকেই খুবই ভয়-ভীতি ও বিনয়ের সাথে ক্ববরের সামনে দাঁড়িয়ে অথবা নামাযের কায়দায় বসে কবরকে সামনে রেখে সিজদায় পড়ে গিয়ে খুবই অনুনয় ও বিনয় করে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে দিয়ে নিজ নিজ জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য (যেমন-কেউবা কঠিন রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, কেউবা সন্তান লাভের জন্য, কেউবা পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করার জন্য, কেউবা ব্যবসায়ে অধিক লাভবান হওয়ার জন্য, কেউবা ইলেকশনে পাশ করার জন্য, কেউবা বিদেশে যাওয়ার জন্য, কেউবা কোন মেয়েকে বিবাহ করার জন্য... ইত্যাদি বিষয়ে)

এমন কাকুতি-মিনতি সহকারে তারা ক্ববর বাসীর নিকট দু'আ করতে থাকে– যা দেখলে অবাক লাগে। অথচ ঐ সমস্ত ক্ববর ও পীর পূজারীদেরকে মহান আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে ক্ববর ও জাহান্নামের কঠিন আজাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মহান আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানিয়ে এমনভাবে কাকুতি-মিনতি সহকারে দু'আ করতে সহজে দেখা যায় না। আর অনেক সময় ক্ববর পূজারীরা ক্ববর বাসীকে সম্বোধন করে বলতে থাকে– হে খাজা বাবা! হে দয়াল বাবা! হে আব্দুল ক্বাদের জিলানী! হে বাবা শাহজালাল! হে বাবা মাইজভাণ্ডারী! হে বাবা আটরশী! হে বাবা কিল্লাশাহ! হে বাবা সাঈদাবাদী! হে বাবা আয়নার কারিগর! ...। আমি বহুদূর হ'তে, অন্যদেশ হ'তে বহু কষ্ট করে তোমার দরবারে এসেছি বাবা! তুমি আমাকে নিরাশ করো না। বাবা! তুমি আমাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিওনা... ইত্যাদি। ঐ শুনুন ক্ববর ও পীর পূজারীদের কণ্ঠে–

ক. আল্লাহর ধন নবীকে দিয়া; আল্লাহ গেছেন গায়েব হইয়া
নবীর ধন খাজাকে দিয়া; নবী গেছেন খালি হইয়া
কেউ ফেরেনা খালি হাতে; খাজারে তোর দরবার হ'তে।

খ. কত সন্তানহারা মায়, একটা সন্তানের আশায়
তোমার দরবারে বাবা শিন্নী লইয়া যায়।

গ. নি:সন্তান মা সন্তান পেয়ে–– কেল্লা বাবার দরবারে
কেউ নেয় গরু-ছাগল–– কেউবা হয় বাবার পাগল।

** এ ধরনের কথা বলা ও বিশ্বাস করা সবই শির্ক তথা হারাম।

এছাড়া অনেক ক্ববর ও পীর পূজারীরা বিশ্বাস করে যে, নামধারী ঐ সমস্ত ওয়ালী-আওলিয়ারা এবং পীর-ফকীরদের দুনিয়া পরিচালনার ব্যাপারে অনেক হাত আছে, এছাড়া তারা মানুষের ভাল ও মন্দ করার ক্ষমতা রাখে। তাদের এ সমস্ত বিশ্বাস ও ধারণার সবই মিথ্যা ও তাদের কল্পনা মাত্র। কেননা ঐ সমস্ত নামধারী পীর-মুর্শিদরা তো দূরের কথা-আল্লাহ তা'আলার নাবী ও রাসূলগণও মহান আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে নিজের নাফছের জন্য এবং অন্যের জন্য কোন প্রকার ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখেন না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তাঁর নাবীকে লক্ষ্য করে বলেছেন,

﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (يونس:١٠٧)

অর্থঃ "হে নবী ! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আল্লাহ যদি আপনার উপর কোন কষ্ট বা বিপদ-আপদ আরোপ করেন, তাহলে একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ ঐ বিপদ-আপদ দূর করতে পারবে না। এমনিভাবে ঐ আল্লাহ যদি আপনার কোন কল্যাণ বা মঙ্গল কামনা করেন, তাহ'লে কেউ আল্লাহর ঐ মেহেরবানীকে বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না। তিনি তাঁর বান্দাহদের মধ্য হ'তে যাকে ইচ্ছা তাকে কল্যাণ দান করেন, কারণ তিনিই তো ক্ষমাকারী ও পরম দয়ালু।" (ইউনুস,১০৭)

মানুষেরা নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা মিটানোর জন্য, বিভিন্ন প্রকার বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য যাদের কাছে আবেদন-নিবেদন করে, ফরিয়াদ করে বা সাহায্য প্রার্থনা করে– তারা যে সামান্যতম কোন বস্তুর

মালিক নয়, আর তারা যে সামান্যতম কোন উপকার করারও ক্ষমতা রাখে না– এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ﴾ (فاطر:١٣)

অর্থঃ "আর তোমরা যারা মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে (সাহায্যকারী, সুপারিশকারী এমনকি উপাস্য মনে করে) ডাক, তারা তো সামান্য একটা খেজুরের আঁটির উপরের হালকা-পাতলা সাদা পর্দারও মালিক নয়।" (ফাতির,১৩)

আর অধিকাংশ কবর ও পীর পূজারীরা এ বিশ্বাস করে যে, নামধারী ওয়ালী-আওলিয়ারা ও পীর-ফকিরেরা গায়েবের খবর রাখে। তাদের এ ধারণা ও বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তথা মিথ্যা। কারণ একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ার আর কেউ এমনকি আল্লাহর সম্মানিত ফিরিশতারা ও নাবী-রাসূলগণ এমনকি আমাদের নাবীও গায়েবের খবর জানতেন না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا﴾ (الأنعام:٥٩)

অর্থঃ "গায়েবের সমস্ত চাবিকাঠি একমাত্র মহান আল্লাহর হাতে, একমাত্র তিনি ব্যতীত দুনিয়ার আর কেউ গায়েবের খবর রাখেন না। এছাড়া জলে স্থলে যা কিছু আছে সবকিছুরই একমাত্র তিনিই খবর রাখেন, এমনকি তাঁর অজ্ঞান্তে কোন গাছের একটি পাতাও ঝরে পড়ে না।" (আল-আনআম, ৫৯)

সৃষ্টির সেরা মানুষ, সমস্ত নাবী ও রাসূলদের মাঝে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন– তিনি আমাদের প্রিয়নাবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) তিনিও নিজের নফসের জন্য কোন ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখতেন না এবং গায়েবের খবরও জানতেন না।

এ প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূলকে লক্ষ্য করে বলেছেন,

﴿قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيْرٌ وَبَشِيْرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ﴾ (الأعراف:١٨٨)

অর্থঃ "হে মুহাম্মাদ! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আপনি (আপনার উম্মাতকে) বলে দিন যে, মহান আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত আমি নিজেরও কোন ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখিনা। আমি যদি গায়েবের খবর জেনে নিতে পারতাম; তাহলে একদিকে আমি বহু কল্যাণ অর্জন করে নিতে পারতাম, আর অপর দিকে কোন বিপদ-আপদ ও অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। আমি তো শুধু ঈমানদারদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা ছাড়া আর কিছুই নই।" (আল-আ'রাফ, ১৮৮)

উল্লিখিত আয়াতের আলোকে এবং বাস্তবতার দিকে লক্ষ্য করে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) যদি নিজের ইচ্ছা মতো নিজের ভাল ও মন্দ করার ক্ষমতা রাখতেন আর গায়েবের খবরও যদি জানতেন– তাহ'লে কোন বিপদ-আপদ বা কোন অকল্যাণ তাঁকে স্পর্শ করতে পারত না। যেমন বলা যেতে পারে যে, তিনি যদি গায়েবের খবর জানতেন তাহ'লে তিনি ত্বায়েফের ময়দানে যেয়ে ত্বায়েফ বাসীদের দ্বারা প্রস্তরাঘাতে রক্তাক্ত হ'তেন না। ওহুদের যুদ্ধে চরমভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে তাঁর দাঁতগুলি শহীদ হ'ত না আর রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর চাচা আমীর হামজা (রাঃ) সহ ৭০জন ছাহাবী শহীদ হ'তেন না। এমনিভাবে তিনি এক ইয়াহুদী মহিলা কর্তৃক বিষ মিশ্রিত ছাগলের গোশত

খেয়ে বিষ যন্ত্রনায় আক্রান্ত হতেন না। এমনিভাবে তিনি অপর এক ইয়াহুদী মহিলা কর্তৃক যাদুর দ্বারাও রোগে আক্রান্ত হতেন না। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, স্থান-কাল ও পাত্র ভেদে তথা প্রয়োজন মুতাবিক মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যে সমস্ত বিষয়ে ওহী এবং ফিরিশতাদের মাধ্যমে আগেই অবগত করিয়ে দিয়েছিলেন– সে সমস্ত বিষয়ে কেবল তিনিই জানতেন অন্য কেউ জানত না। এ ধরনের বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) গায়েবের খবর রাখতেন এ কথা বলা মোটেই ঠিক হবে না।

পক্ষান্তরে যারা দাবী করে যে, জীবিত কিংবা মৃত পীর-ফকীর ও ওয়ালী-আওলিয়ারা মানুষের ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখে, দুনিয়া পরিচালনার ব্যাপারে তাদের হাত আছে আর তারা গায়েবের খবর রাখে। তাদের এ সমস্ত ধারণা ও বিশ্বাস মিথ্যা ও কল্পনা প্রসূত। বলা যেতে পারে যে– পাকভারত উপমহাদেশে প্রসিদ্ধ আব্দুল ক্বাদের জিলানী, খাজা মঈনউদ্দীন চিশতী, শাহ জালালসহ আটরশী, সাঈদাবাদী, দেওয়ানবাগী এবং আরো নাম জানা অজানা হাজার হাজার নামধারী অলী-আওলিয়া ও পীর-ফকীর– যাদেরকে লক্ষ লক্ষ মানুষেরা শ্রদ্ধা করে, বিপদে-আপদে পড়ে যাদের নাম স্মরণ করে, আশা-আকাঙ্ক্ষা পুরনের জন্য যাদের নামে মানত মানে, যাদের ক্ববরে-মাজারে ও খানকায় যেয়ে অকাতরে টাকা-পয়সা দান করে, গরু-ছাগল যবেহ করে ইত্যাদি। এমনকি ঐ সমস্ত ক্ববরের উপরে আতর, গোলাপজল ও ফুল ছিটান হচ্ছে, আগরবাতি, মোমবাতি ও বিজলি বাতি জ্বালানো হচ্ছে, ফ্যান ঘুরানো হচ্ছে, সামিয়ানা টানানো হচ্ছে এবং ফুলের গালিচা বিছানো হচ্ছে ইত্যাদি। নিঃসন্দেহে উল্লিখিত কাজগুলির সবই শির্ক তথা হারাম।

আর ঐ সমস্ত মৃত ও জীবিত নামধারী পীর-ফকীর ও ওয়ালী-আওলিয়ারা অন্যের উপকার করা তো দূরের কথা– বরং তারা নিজেদের জন্য সামান্যতম ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখেনা। যেমন তাদের দাফন করার পরে তাদের শরীরের উপর থেকে মাটিগুলি সরিয়ে দেয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। এমন কি কোন ক্ববর-মাযার ও খানকার ওপর যদি কোন শিয়াল-কুকুর পেশাব-পায়খানাও করে দেয়, তবুও তাদের কিছুই করার নেই। এমতাবস্থায় ঐ সমস্ত নামধারী পীর-ফকীর ও ওয়ালী-আওলিয়ারা কিভাবে আপনাকে সাহায্য করবে, কিভাবে আপনাকে গাড়ীর এক্সিডেন্ট থেকে বাঁচাবে? কিভাবে নৌকা, লঞ্চ ও জাহাজ ডুবির হাত হ'তে আপনাকে রক্ষা করবে? কিভাবে আপনার ছেলের পরীক্ষার রেজাল্ট ভাল করে দেবে? কিভাবে আপনার ব্যবসায় সার্বিক ক্ষতির হাত থেকে বাঁচিয়ে আপনাকে লাভবান করে দেবে? কিভাবে আপনাকে সন্তান দান করবে? কিভাবে আপনার চুরি হয়ে যাওয়া বা হারিয়ে যাওয়া জিনিস-পত্র বা গরু-ছাগলের সন্ধান দিবে? কিভাবে আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মনোমিল সৃষ্টি করে দেবে? কিভাবে অন্য পুরুষ বা মহিলাকে আপনার বাধ্যগত করে দেবে? এ সমস্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আপনার ঐ সুস্থ বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে দেখুন তো কী জবাব আসে?

৩. গায়রুল্লাহ্‌র নামে যবেহ্ করা (الذبح لغير الله)

'গায়রুল্লাহ্' অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টি বা কোন প্রকার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যে কোন জীব-জানোয়ার যবেহ্ করাকে গায়রুল্লার নামে যবেহ করা বুঝায়, যা প্রকাশ্য শির্কের মধ্য হতে এক অন্যতম শির্ক তথা হারাম। বর্তমান যুগে বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশে এই শির্কের ছয়লাব বয়ে চলেছে। নিম্নে পাঠকদের খেদমতে গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করার বিধান এবং বাংলাদেশের পেক্ষাপটে এই শির্কের কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশা'আল্লাহ্।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবীকে লক্ষ্য করে বলেছেন,

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (العصر: ٢)

অর্থঃ "হে মুহাম্মাদ! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আপনি আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন আর কুরবানী করুন" (অর্থাৎ আপনি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের জন্য একমাত্র তাঁরই জন্যে নামায পড়ুন আর জানোয়ার যবেহ করুন, অন্য কারো নামে নয়)। (আল-কাওসার, ২)

"গায়রুল্লাহ"এর নামে কোন জানোয়ার যবেহ করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন, "لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ" অর্থঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে অর্থাৎ অন্যের সন্তুষ্টি অর্জনার্থে কোন জানোয়ার যবেহ করল, সে ব্যক্তির উপর আল্লাহ তা'আলা অভিশাপ দিয়ে থাকেন" (মুসলিম)। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ...﴾ (المائدة: ٣)

অর্থঃ "তোমাদের উপর মৃত জানোয়ারের গোশত, প্রবাহিত রক্ত, শূকরের গোশত, এবং ঐ সমস্ত জানোয়ারের গোশত খাওয়া হারাম করা হয়েছে যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা হয়... "(আল-মায়িদা,৩)।

উল্লিখিত দু'টি আয়াত ও একটি হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টি অর্জন বা কাউকে খুশী করার মাধ্যমে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা পূরণের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত জীব-জানোয়ার যবেহ করা হয়, বা হাদীয়া ও মানত দেয়া হয়– তা সবই শির্ক তথা হারাম। যদিও ঐ সমস্ত জানোয়ার যবেহ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উল্লেখ করা হোক না কেন। কেননা প্রকৃতপক্ষে ঐ সমস্ত নামধারী পীর-ফকীর ও ওয়ালী-আওলিয়াদের সন্তুষ্টি হাছিলের জন্যেই ঐ সমস্ত জানোয়ারগুলিকে বহুদূর থেকে বহন করে নিয়ে এসে ঐ সমস্ত পীর-ফকীরদের দরবারে বা ওরশে যবেহ করা হয়। যেমন বর্তমান বাংলাদেশের বৃহত্তর নোয়াখালি, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা হ'তে যে সমস্ত গরু-ছাগল আটরশী ওরশে নিয়ে এসে এমনিভাবে আরো যে সমস্ত কবরে-মাযারে ও পীর সাহেবদের দরবারে যবেহ করা হচ্ছে–এ ধারণা ও উদ্দেশ্য নিয়ে যে, ঐ সমস্ত পীর-ফকীরদের নেক-নযর ও সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে দুনিয়ার জীবনে সকল প্রকার বিপদ-আপদ হ'তে মুক্তি পাওয়া যাবে, সকল প্রকার সমস্যা দূর হবে,আর পরকালে তাদের সুপারিশে জান্নাত লাভ করা যাবে ইত্যাদি। প্রকৃত পক্ষে গায়রুল্লাহর নামে যবেহকৃত ঐ সমস্ত

জানোয়ারের গোশত খাওয়া আর মৃত জানোয়ার ও শূকরের গোশত খাওয়ার মাঝে কোনই পার্থক্য নেই- সবই হারাম আর হারাম। এই হারাম খাওয়া এবং শির্কী কাজের ভিতর বাংলাদেশের শতকরা কতজন নামধারী পীর-মুর্শিদ, তাদের মুরীদান ও কবর পূজারী মুসলিম ভাইয়েরা হাবুডুবু খাচ্ছে, একবার হিসাব করে দেখেছেন কি? আপনি নিজেও আপনার বুকের উপর হাত রেখে একটু চিন্তা করে বলুন তো, আপনি এই শির্কী কাজ ও হারাম খাওয়া থেকে বিরত থাকতে পেরেছেন কি?

বর্তমান বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৬০% ভাগ অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত ও শিক্ষিত... সকলশ্রেণীর সরলমতি নামধারী মুসলিম ভাই ও বোনেরা এই জঘন্য পীর ও ক্ববর পূজার সাথে কম-বেশি জড়িত। বর্তমান বাংলাদেশের প্রায় ৭০ হাজার গ্রামের মধ্য হ'তে এমন একটা গ্রাম খুঁজে পাওয়া যাবে কি যে গ্রামের কোন মানুষ পীর পূজা ও ক্ববর পূজার সাথে জড়িত নেই অর্থাৎ তারা বিপদে-আপদে পড়ে কোন ক্ববরে -মাযারে, ওরশে বা কোন পীরের দরবারে যায় না এবং সেখানে যেয়ে কোন প্রকার মানত, নযর-নিয়ায ও হাদীয়া হিসাবে কোন কিছুই দান করে না, বরং সর্ব ক্ষেত্রে একমাত্র মহান আল্লাহর উপরে ভরসা করে, একমাত্র মহান আল্লাহর কাছেই সাহায্য চায় এমন একটা গ্রামও কি খুঁজে

৪. যাদু, ভাগ্য গণনা ও হারানো বস্তুর সন্ধান দেওয়ার দাবী করা

(السِّحْرُ وَالْكِهَانَةُ وَالْعِرَافُ)

যাদু, ভাগ্যগণণা করা, আর হারানো বস্তুর সন্ধান দান করা নিঃসন্দেহে এগুলির প্রত্যেকটাই কুফরী ও শির্কের পর্যায়ভুক্ত তথা পরিষ্কার হারাম। যাদু নিশ্চয়ই একটা কুফরী কাজ এবং মানুষকে ধ্বংসকারী ৭টা বড় জিনিসের মধ্য হ'তে তা একটি। যাদু মানুষের সার্বিকভাবে ক্ষতি করে। তা কোন প্রকারেই মানুষকে উপকার দিতে পারে না। আর এ জন্যেই যাদু শিক্ষার অপকারিতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ...﴾ (البقرة:١٠٢)

অর্থঃ "ঐ সমস্ত লোকেরা ঐ জিনিস অর্থাৎ যাদু শিখতে লাগল যা তাদের ক্ষতি করে এবং যা তাদের কোনই উপকার করতে পারে না" (আল-বাক্বারাহ,১০২)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ (طـــه:٦٩)

অর্থঃ "যাদুকর যেভাবেই আসুক না কেন, সে কোন কল্যাণ লাভ করতে পারবে না" (ত্বাহা, ৬৯)। আর অধিকাংশ উলামাদের মতে যাদু চর্চাকারী এবং যাদুর সহযোগিতা গ্রহণকারীও কাফের। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَـــدٍ حَتّـــى يَقُوْلَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ (البقرة:١٠٢)

অর্থাৎ "সুলায়মান (আঃ) কুফরী করেন নি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। শয়তানরা মানুষকে যাদু বিদ্যা শিক্ষা দিত আর বাবেল শহরে হারুত ও মারুত নামক দুই ফিরিশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, শয়তানরা তাও মানুষকে শিক্ষা দিত। হারুত ও মারুত দু' ফিরিশতাই যখনই কোন মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত– তখনই তারা প্রথমেই মানুষদেরকে বলে দিত যে, নিশ্চয়ই আমরা কিন্তু পরীক্ষার জন্য এসেছি, কাজেই তুমি (যাদু শিখে) কাফের হয়ো না।" (আল-বাক্বারাহ, ১০২)

ইসলামী বিধানে যাদুকরকে হত্যা করার কথা বলা হয়েছে। যাদুকরের উপার্জন অপবিত্র ও হারাম। অধিকাংশ মূর্খ, অত্যাচারী ও দুর্বল ঈমানের লোকেরা অন্যের সাথে শত্রুতা ও হিংসার বশবর্তী হয়ে যাদুকরদের নিকটে যায়।

অতএব মানুষের মধ্য হ'তে যারা যাদু ছাড়ানোর জন্য বা যাদুর কার্যক্রম হ'তে মুক্ত হওয়ার জন্য যাদুকরদের সাহায্য গ্রহণ করে তারাও ঐ হারাম কাজে জড়িয়ে পড়বে। যাদুর কার্যক্রম হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্য মহান আল্লাহর আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করা এবং আল্লাহর কুরআনের দ্বারা আরোগ্য লাভ করা ওয়াজিব। যেমন সূরা 'নাস' ও 'ফালাক্ব'সহ কুরআন মাজীদের আরো অন্য সূরা ও আয়াতের দ্বারা আরোগ্য লাভ করার চেষ্টা করা।

গণক ও হারানো বস্তুর সন্ধানদাতা উভয়েই আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকারকারী কাফেরদের দলভুক্ত। কারণ তারা উভয়েই গায়েব তথা অদৃশ্যের কথা জানার দাবী করে থাকে। অথচ একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ার আর কেউ গায়েবের খবর রাখে না।

অনেক সময় তারা সরল মনা লোকদের সম্পদ লুটে-পুটে নেওয়ার জন্য তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে যাদুর প্রতি আকৃষ্ট করে

থাকে। এ জন্য তারা বালুর উপর আঁকি-বুঁকি, চটা চালান, হাতের তালুতে ফুঁক, চায়ের পেয়ালা, কাঁচের গুলি, আয়না ইত্যাদি বিষয় ও বস্তু ব্যবহার করে থাকে। এ সব লোকের কথা একটা যদি সত্যি হয় তাহ'লে নিরানব্বইটাই হয় মিথ্যা। কিন্তু জাহেলরা ঐ সমস্ত ধোঁকাবাজদের ১ সত্যকেই হাজার সত্য গণ্য করে নিজেদের ভবিষ্যৎ, ভাগ্য, বিয়ে-শাদী, ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভাশুভ সবই তাদের নিকট জানতে চায়। তারা হারানো জিনিস কোথায় কিভাবে পাওয়া যাবে তা জানার জন্য তাদের নিকটে ছুটে যায়। যারা তাদের কাছে গিয়ে তাদের কথা বিশ্বাস করবে– তারা কাফের হয়ে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ" (احمد, ٢/٤٢٩, الباني, صحيح الجامع, ح/٥٩٣٩)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি কোন গণক কিংবা হারানো বস্তুর সন্ধান দাতার নিকটে যায় আর সে যা বলে তা বিশ্বাস করে, তাহ'লে সে অবশ্যই মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর উপর যে কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হয়েছে তাকে অস্বীকার করল" (আহমাদ ২/৪২৯, আলবানী, ছহীহুল জামে হাদীছ ৫৯৩৯)।

রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আরো বলেছেন,

" مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةُ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً"

অর্থঃ "যে ব্যক্তি কোন হারানো বস্তুর সন্ধান দাতার নিকট যায় আর তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে, তার ৪০ দিনের নামায আল্লাহর দরবারে ক্ববুল হবে না" (ছহীহ মুসলিম, হাদীছ ১৭৫১)। তাকে নামায অবশ্যই পুনরায় আদায় করতে হবে আর বিশেষভাবে তাওবা করতে হবে।

৫. নিরাপত্তা লাভের উপায়সমূহ

(أسباب حفظ الله تعالى للعبد)

বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তির জন্য, মানুষের বদ নযর হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্য, শয়তানের প্ররোচনা ও ক্ষতি হ'তে বেঁচে থাকার জন্য, ছেলে-মেয়ে লাভের জন্য, পরস্পর গাঢ় ভালবাসা ও মহব্বত সৃষ্টি করার জন্য, রাস্তায় যানবাহনের দুর্ঘটনা হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্য, পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করার জন্য, ব্যবসা বাণিজ্যে অধিক আয় উন্নতির জন্য, নতুন বাড়ীতে শয়তানী কার্যক্রম ও শয়তানের সার্বিক ক্ষয়-ক্ষতি হ'তে মুক্তির জন্য- মোট কথা উল্লিখিত সকল প্রকার বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের ধাতু দ্বারা নির্মিত যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, পাথর, তামা ও লোহার আংটি, ফিতা ও সূতার কায়তান এবং এ জাতীয় আরো অন্য কিছু ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া কুর'আন শরীফের আয়াত বা আয়াতের নাম্বার যে কোন কালি দিয়ে বা জাফরানের কালি দিয়ে লিখে এবং বিভিন্ন ধরনের নকশা এঁকে দু'আ, তাবীয ও কবয বানিয়ে তা হাতে, কোমরে, গলা ও মাথায় ঝুলানো হয় এবং দুষ্ট শয়তানকে বন্দী করে রাখার জন্য ঐ সমস্ত দু'আ, তাবিয ও মাদুলিগুলি ঘরের চার কোণায় বা বাড়ীর চার কেণায় মাটিতে পুতে রাখা হয়। উল্লিখিত কাজগুলির অধিকাংশই জাহেলী যুগে প্রচলিত ছিল, যা পরিষ্কার শিরক তথা হারাম। কেননা রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তাবিজ, কবচ ও মাদুলি ঝুলালো বা বাঁধল সে আল্লাহর সাথে শিরক করল"। এ মর্মে কুর'আন ও হাদীছ থেকে আরো বহু দলীল আছে। তবে কুরআন শরীফ পড়ে ঝাঁড়-ফুঁক করা যাবে।

** যে সমস্ত কাজের দ্বারা মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষের জান, মাল ও পরিবারকে সকল প্রকার বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে থাকেন এবং মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন পূরণ করে থাকেন, তার মধ্য থেকে কয়েকটি বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১- সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে তথা সর্বাবস্থায় একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর উপর ভরসা করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (الطلاق:٣) অর্থঃ "যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করবে আল্লাহই (সর্বাবস্থায়) তার জন্য যথেষ্ট"।

২- আল্লাহর আদেশ ও নিষেধগুলি যথাযথ ভাবে পালন করা, যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাযথভাবে আদায় করা, হালাল উপার্জন করা ও হালাল খাওয়া। এমনিভাবে সকল প্রকার হারাম কার্যক্রম যেমন সুদ-ঘুষ খাওয়া ও অপরকে সুদ-ঘুষ দেওয়া, মিথ্যা কথা বলা, গালি-গালাজ করা, অন্যের গিবত করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা।

৩-'আয়াতুল কুর্সী' প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে এবং ঘুমানোর সময় পড়া।

৪- প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ১বার করে এবং প্রতিদিন সকাল ও সন্ধায় ৩বার করে সূরা আন-নাস ও সূরা আল-ফালাক্ব পড়া।

৫- প্রতিদিন সকাল ও সন্ধায় নিম্নের দু'আ দুটি পড়া।

"أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ"

উচ্চারণঃ 'আউযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম মা-তি মিন শাররি মা-খালাক্ব'

"بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِيْ الْأَرْضِ وَ لا فِيْ السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ"

উচ্চারণঃ 'বিসমিল্লা-হিল্লাযী লা-য়াযুররু মা'আ ইসমিহি শাইয়ুন ফীল আরযি অলা- ফিসসামা-য়ি অহুআস সামীউল আলীম'।

৬–বাড়ী হতে বের হওয়ার সময় নিম্নের দু'আ পড়া

"بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ. وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ"

উচ্চারণঃ 'বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু আলাল্লা-হি অলা-হাওলা অলা-কুওওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ'

৫. 'গায়রুল্লাহ্' এর নামে শপথ করা

(الْحَلْفُ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى)

'গায়রুল্লাহ'এর নামে অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নামে কসম খাওয়া বা শপথ করা বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত। আর এ জন্যেই গায়রুল্লাহর নামে শপথ করা ইসলামী শরী'য়াতে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। সৃষ্ট জীব ও বস্তুর মধ্য হ'তে যে কোন বস্তুর দ্বারা মহান আল্লাহ কসম খেতে পারেন, এটা আল্লাহর জন্য জায়েয, তাতে মহান আল্লাহর সম্মানের বা মর্যাদার কোন হানি হয় না। অপরদিকে সৃষ্টিজীবের পক্ষে অর্থাৎ ফিরিশতা, জ্বিন ও মানুষের জন্য একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা নাজায়েয বা হারাম। অথচ বর্তমান যুগে বহু মানুষ কথায় কথায়

বা সামান্য ব্যাপারে গায়রুল্লাহর নামে কসম করে থাকে, যা পরিষ্কার শির্ক তথা হারাম।

১. মানুষেরা সাধারণতঃ নিজের কথা, দাবী ও মতামতকে মানুষের সামনে অভ্রান্ত ও অকাট্য

প্রমাণ করার জন্য বলিষ্ঠ কণ্ঠে কারো নামে কসম করে থাকে।

২. আর এ কথা সত্য যে, বান্দার তরফ থেকে যার নামে শপথ করা হয় তার সর্বাধিক সম্মান

ও উচ্চ মর্যাদা প্রমাণিত হয়।

৩. আর প্রকৃত পক্ষে সর্বাধিক সম্মান ও সর্বউচ্চ মর্যাদা পাওয়ার হক্বদার হিসাবে একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ নেই। সেহেতু মানুষের পক্ষে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে কসম করা জায়েয নয়। 'গায়রুল্লাহ'এর নামে শপথ করার পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ" (صحيح رواه أحمد)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম খেল, সে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্ক করল" (আহমাদ, হাদীছ ছহীহ)। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আরো বলেছেন,

"ألا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ عَنْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا بِاللهِ فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ" (بخاري و فتح الباري ١١/٥٣٠)

অর্থঃ "সাবধান ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষদের (পিতা-মাতার) নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন, আর যে ব্যক্তি কোন কিছুর কসম খেতে চায়, সে যেন একমাত্র আল্লাহর নামে কসম খায় অথবা (অন্যকারো

নামে কসম না খেয়ে) সে যেন চুপ থাকে" (বুখারী, ফাতহুলবারী ১১/৫৩০ পৃঃ)। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আরো বলেছেন,

"مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا" (أبو داود, صحيح)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি (নিজের অথবা অন্য কারোর) আমানতদারীর কথা উল্লেখ করে কসম খেল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়" (আবূদাউদ, হাদীছ ছহীহ)। যেমন কোন নাবী, রাসূল ও নামধারী ওয়ালী-আওলিয়াদের সম্মান, মর্যাদা, সাহায্য-সহযোগিতা, বরকত ও কল্যাণের দ্বারা কসম খাওয়া, এমনিভাবে বাপ-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানী ও ছেলে-মেয়েদের নামে কসম করা, বা তাদের মাথায় হাত রেখে কসম করা ইত্যাদি ...সবই শির্ক তথা হারাম যদি কোন মানুষ অভ্যাসগত বা ইচ্ছাকৃতভাবে উল্লিখিত বিষয়গুলির নামে কসম করে ফেলে— তাহ'লে তার এই

হারাম কসমের কাফফারা বা জরিমানা হলোঃ সে তখনই "لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ" (লা- ইলা- হা ইল্লাল্লা-হু) অর্থ "একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই" এই কালিমা পড়ে নেবে। কেননা রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِيْ حَلْفِهِ بِاللاَّتِ وَ الْعُزَّى فَلْيَقُلْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ" (البخاري)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি কসম করার সময় 'আল-লাত' ও 'আল-মানাত' অর্থাৎ আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো নামে কসম করল, তাহ'লে সে এই হারাম কসমের কাফফারা স্বরূপ সে যেন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এ কালিমা পড়ে নেয়" (বুখারী)।

***এমনিভাবে আরো কিছু শির্কী কথা আছে— যা ছোট শির্কের অন্তর্ভুক্ত, যা কিছু কিছু মানুষেরা প্রায়ই বলে থাকে। যেমনঃ

১. আমি আল্লাহর নিকট এবং তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।

২. আমার আর কেউ নেই, আমি একমাত্র আল্লাহর উপর আর তোমার উপর ভরসা করি।

৩. এটা একমাত্র আল্লাহ আর তোমার পক্ষ থেকেই হয়েছে।

৪. আল্লাহ আর তুমি ছাড়া আমাকে দেখার আর কেউ নেই।

৫. আসমানে আমার জন্য একমাত্র আল্লাহ আছে, আর যমীনে একমাত্র তুমি আছ।

৬. আজকে যদি আল্লাহ এবং তুমি না থাকতে তাহ'লে আমার সবই ধ্বংস হয়ে যেত।

প্রকাশ থাকে যে, উল্লিখিত বাক্যগুলিতে আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশী স্থাপন করা হয়েছে, সেহেতু ঐ সমস্ত কথাগুলি শির্ক তথা হারাম। ঐ সমস্ত বাক্যগুলিতে 'এবং' শব্দের স্থানে 'অতঃপর' শব্দ ব্যবহার করে বলা জায়েয আছে। তাহ'লে তাতে আর শির্কের ভয় থাকবে না। যেমন এভাবে বলা যাবে—

১. আমি আল্লাহর নিকট অতঃপর আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।

২. আমি আল্লাহর উপর অতঃপর আপনার উপর ভরসা করি... ইত্যাদি।

এছাড়া যে কোন সময়, রাত-দিন, কাল বা যুগকে গালি দেয়া, দুর্নাম করা এবং অশুভ মনে করা সবই নিষেধ তথা হারাম। কারণ সময়, দিন-রাত, যুগ ও কালকে গলি দেয়া, দুর্নাম করা এবং অশুভ মনে করা মানেই মহান আল্লাহকে গালি দেয়া,

দুর্নাম করা ও অশুভ মনে করা হলো। কেননা সময়, কাল ও যুগকে তো মহান আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। যেমন অনেকেই এভাবে বলে থাকে যে, শেষ যামানা বড়ই খারাপ, এই সময়টা অকল্যাণকর বা অশুভ, এ যামানা গাদ্দার বা প্রতারক। শনিবার ও মঙ্গলবার অশুভদিন, কাজেই এ দু'দিনে কাউকে বিবাহ দেয়া যাবে না আর কাউকে বিবাহ করাও যাবে না। এমনিভাবে এ দু'দিনে বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কাটা যাবে না। এমনিভাবে শনিবার, রবিবার ও শুক্রবারের দিনগত রাত্রগুলি অশুভ, অতএব এ সমস্ত রাত্রে স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করা যাবে না। কেননা এ সমস্ত রাত্রে স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করার ফলে যে সন্তান আসবে তা কুসন্তান হবে (নাউযুবিল্লাহ)।

এমনিভাবে অনেকেই পথে চলার সময় যদি ব্যাঙ লাফ দিয়ে বাম দিকে চলে যায়-তবে তাকে অশুভ মনে করে। আর যদি কেউ বাড়ী হ'তে বের হওয়ার পরে অথবা রাস্তায় চলার সময় কাউকে খালি কলস নিয়ে ফিরে আসতে দেখে তাহ'লে তাকে অশুভ মনে করে। আর অনেকেই এভাবে বলে থাকে যে- আজকে যদি বাড়ীতে কুকুরটা না থাকত! তাহ'লে চোরে সবই চুরি করে নিয়ে যেত, কুকুরটা চুরির হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। আর অনেকেই এভাবেও বলে থাকে যে, গতরাত্রে হঠাৎ করে রাত ৩টার সময় ছেলেটাকে কঠিনভাবে ডাইরিয়া আক্রমণ করে, ঐ সময়েই যদি সরকারী বা অমুক ডাক্তারকে না পাওয়া যেত তাহ'লে ছেলেটাকে আর বাঁচানো যেত না। উল্লিখিত বিষয়গুলি অর্থাৎ সময়, দিন-রাত, যুগ ও কালকে বিভিন্নভাবে গালি দেয়া, দুর্নাম করা ও অশুভ মনে করা- এমনিভাবে ব্যাঙ ও খালি কলসকে অশুভ মনে করা এবং কুকুর ও ডাক্তারকে বিপদ মুক্তির ওয়াছিলা মনে করা এ সবই ছোট শির্কের অন্তর্ভুক্ত তথা হারাম।

অতএব এ সমস্ত কথা, ধারণা ও বিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে সর্বক্ষেত্রে ও সর্ববিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে একমাত্র তাঁরই উপর ভরসা করার পূর্ণ তাওফীক্ব দান করুন আমীন।

মোট কথা প্রতিটি মুহূর্তে তথা সুঃখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, এমনিভাবে চলা-ফেরা, উঠাবসায় তথা সর্বাবস্থায় একজন মুসলমানের মুখ থেকে আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা সম্বলিত এবং সকল প্রকার শির্ক বর্জিত পূর্ণ তাওহীদের কথাই প্রকাশ পাওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন অনেক্ষন বসে থাকার পরে উঠে দাঁড়ানোর সময় আল্লাহু আকবার বলা যেতে পারে। কিন্তু অধিকাংশই উঠে দাঁড়ানোর সময় ও মাগো! ও বাবারে ! ইয়া আলী ! ইয়া খাজা! ইয়া বাবা! এভাবে বলে থাকে। কিন্তু এ ভাবে বলা মোটেই ঠিক নয়। এমনিভাবে পথে চলতে চলতে পায়ে হোঁচট খেয়ে এবং ভাত খাওয়ার সময় বিষম লাগলে 'ইন্নালিল্লাহ' বা 'আল্লাহু আকবার' বলা যেতে পারে, এ ছাড়া অন্য কারো নাম স্মরণ করা ছোট শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

৬. আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে মানত মানা

(اَلنَّذْرُ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى)

'মানত' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলোঃ উৎসর্গ করা, নিবেদন করা, প্রতিজ্ঞা করা, উপঢৌকন বা উপহার দেয়া ইত্যাদি। আর 'মানত' শব্দের পারিভাষিক অর্থ হলোঃ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য বা সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে স্বেইচ্ছায় আল্লাহর নামে কোন কিছু উৎসর্গ করা বা দান করা। এমনিভাবে কোন ইবাদত করার সংকল্প বা প্রতিজ্ঞা করাকে 'মানত' বলা হয়। এটা ইসলামী শরী'য়াত মুতাবিক জায়েয। যেমন এমরানের স্ত্রী বিবি

হান্না আল্লাহর দরবারে 'মানত' মেনে বলেছিলেন, ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ (آل عمران: ٣٥) অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমি (হে আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য) আমার পেটে যে বস্তু আছে, তা তোমারই জন্য 'মানত' মানলাম।" (আলু-এমরান, ৩৫)

তবে মানুষের জীবনে বিভিন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা পূরণের জন্য মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নামে যেমন ফিরিশতা, নাবী ও রাসূলগণ এছাড়া নামধারী ওয়ালী-আওলিয়া, পীর-ফকীর, গাওস-কুতুব, এমনিভাবে হিন্দুদের কোন মূর্তি, থান বা খানকার নামে 'মানত' করা সবই শির্ক তথা হারাম। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)- এর একটি প্রসিদ্ধ হাদীছ নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

"وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِيْ ذُبَابٍ . قَالُوْا: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: مَرَّ رَجُلاَنِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ لاَ يَجُوْزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شَيْئًا , فَقَالُوْا لأَحَدِهِمَا: قَرِّبْ. قَالَ لَيْسَ عِنْدِيْ شَيْءٌ أُقَرِّبُهُ. قَالُوْا لَهُ: قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا. فَقَرَّبَ ذُبَابًا, فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُ, فَدَخَلَ النَّارَ. وَقَالُوْا لِلآخَرِ: قَرِّبْ. فَقَالَ: مَاكُنْتُ لأُقَرِّبَ لأَحَدٍ شَيْئًا دُوْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَضَرَبُوْا عُنُقَهُ, فَدَخَلَ الْجَنَّةَ" (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

ভাবার্থঃ "ত্বারিক বিন শিহাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন, 'এক ব্যক্তি একটি মাছির কারণে জান্নাতে প্রবেশ করেছে, দ্বিতীয় আর এক ব্যক্তি ঐ একটা মাছির কারণেই জাহান্নামে প্রবেশ করেছে'। ছাহাবীরা একথা শুনে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! (ছাল্লাল্লা-হু

আলাইহি অ-সাল্লাম) এটা কেমন করে হলো? উত্তরে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বললেন, দু' ব্যক্তিই এমন এক গোত্র বা জনগোষ্ঠির পাশ দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করছিল– যাদের জন্য রাস্তার পার্শ্বে পূর্ব থেকে এক মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তারা যখনই ঐ মূর্তির পাশ দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করত তখনই কোন না কোন বস্তু ঐ মূর্তির নামে উৎসর্গ করে পরে রাস্তা অতিক্রম করত। এটা ছিল তাদের চিরাচরিত অভ্যাস বা প্রথা।

উক্ত দু'ব্যক্তি ঐ রাস্তা অতিক্রম করার সময় তাদের মূর্তির নিকটবর্তী হ'লে তারা তাদের দু'জনকে ঐ মূর্তির নিকট কোন বস্তু হাদিয়া দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করতে হবে নতুবা তাদেরকে রাস্তা অতিক্রম করতে দেয়া হবে না এ নির্দেশ জারি করে দিল। গ্রামবাসীরা ঐ দু'জনের প্রথম ব্যক্তিকে বলল, তুমি মূর্তির নিকট কিছু হাদীয়া দাও। উত্তরে সে বলল, হাদীয়া দেয়ার মত আমার কাছে কিছুই নেই। তখন গ্রামবাসীরা তাকে বলল, যদি একটা মাছিও হয় তবুও একটা মাছি মেরে সেখানে হাদিয়া দিতে হবে– নতুবা তোমাকে রাস্তা অতিক্রম করে যেতে দেয়া হবেনা। তখন সে ব্যক্তি একটা মাছি মেরে সেখানে হাদিয়া দিল, ফলে গ্রামবাসীরা তার রাস্তা ছেড়ে দিল। এরপর (এ ভাবে গায়রুল্লাহর নামে সামান্য একটা মাছি মেরে হাদিয়া দেয়ার কারণে) সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। অতঃপর গ্রামবাসীরা দ্বিতীয়জনকে বলল, তুমিও আমাদের মূর্তির নামে কিছু হাদীয়া দাও। তখন সে উত্তরে বলল যে, একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে আমি সামান্যতম কোন বস্তু হাদীয়া দিতে রাজি নই, কারণ এটা বড় শির্ক। তখন গ্রামবাসীরা তাকে হত্যা করল। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করল।" (আহমাদ)

উল্লিখিত হাদীছসহ আরো অন্য হাদীছ ও আয়াতের দ্বারা এটাই প্রমাণিত হলো যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে, ক্ববরে, মাযারে, খানকায়, ও কারো দরবারে আগরবাতি, মোমবাতি, গোলাপজল থেকে শুরু করে হাঁস-মুরগী, ছাগল-গরু, টাকা-পয়সা যে কোন ধরণের জিনিস হোকনা কেন মানত দেয়া পরিষ্কার শির্ক তথা হারাম। বড় আফসোসের বিষয় এই যে, বর্তমান বাংলাদেশের বহু সংখক মানুষ এই শির্কের সাথে জড়িত কিন্তু এই শির্ক থেকে মানুষকে প্রতিহত করার জন্য সরকারী ও বেসরকারীভাবে এবং বিভিন্ন ইসলামী রাজনৈতিক পার্টির পক্ষ থেকে জোরালোভাবে বিশেষ কোন ভূমিকা পালন করা হয় না। তবে শুধু বাংলাদেশে নয় বরং বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী একমাত্র সালাফী বা আহলেহাদীছরাই উল্লিখিত শির্কী কার্যক্রমসমূহ তথা ক্ববর-মাযার ও পীর পূজা থেকে সকল শ্রেণীর মুসলমানদেরকে বিরত রাখার জন্য বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকায় লেখনীর মাধ্যমে, মাসজিদ-মাদরাসায় ও বিভিন্ন সভা-সমিতি ও সমাবেশে আলোচনা ও বক্তব্যের মাধ্যমে সার্বিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন।

৭. রাশিফল ও মানব জীবনের উপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কিত বিশ্বাস করা

(الاعتقاد في تأثير النجوم والكواكب في الحوادث و حياة الناس)

যায়েদ বিন খালেদ আল-জুহানী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, হুদায়বিয়াতে এক রাতে আকাশে এক চিহ্ন দেখা যায়। সেদিন রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) ফজরের নামায শেষে

লোকদের দিকে ফিরে বসেন এবং বলেন, তোমাদের প্রতিপালক কী বলেছেন তা কি তোমরা জান? উত্তরে তারা বলল, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমার কিছু বান্দা আমার উপর বিশ্বাসী হয়ে আর কিছু বান্দা অবিশ্বাসী হয়ে সকালে উঠে। যারা বলে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে বৃষ্টি হয়েছে তারা আমার প্রতি বিশ্বাসী আর গ্রহ-নক্ষত্রে অবিশ্বাসী। আর যারা বলে অমুক অমুক গ্রহের প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে- তারা আমার প্রতি অবিশ্বাসী আর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী হিসাবে গণ্য" (বুখারী, ফাৎহুলবারী সহ ২/৩৩৩)।

গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টি হওয়ার কথা বিশ্বাস করা যেমন কুফরী, তেমনি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রাশিফলের আশ্রয় নেওয়াও কুফরী কাজ। যে ব্যক্তি রাশিফলের উপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবের কথা বিশ্বাস করবে, সে সরাসরি মুশরিক হয়ে যাবে। পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তকে লিখিত রাশিফলের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে সেগুলি পাঠ করা শির্ক। তবে বিশ্বাস না করে কেবল মানসিক সান্ত্বনা অর্জনের জন্য পড়লে তাতে শিরক হবে না বটে, তবে তা কবীরা গুনাহ হিসাবে গণ্য হবে। কেননা শির্কী কোন কিছু পাঠ করে সান্তনা লাভ করা জায়েয নয়। তাছাড়া শয়তান কর্তৃক তার মনে উক্ত বিশ্বাস জন্মিয়ে দিতে অল্প সময়ের প্রয়োজন, ফলে এ পড়াই তার শির্কের সাথে জড়িয়ে যাওয়ার কারণ হ'তে পারে।

৮. আল্লাহ যা হালাল করে দিয়েছেন তা হারাম সাব্যস্ত করা, আর যা হারাম করে দিয়েছেন তা হালাল সাব্যস্ত করা

(تَحْلِيلُ مَا حَرَّمَ اللهُ أَوْ تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللهُ)

ইসলামী বিধান মুতাবিক মানুষের জন্য কোন কিছু হালাল কিংবা হারাম করার একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। কোন মানুষ আল্লাহর দেওয়া হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করার অধিকার রাখে না। তবুও অনধিকার চর্চাবশতঃ মানুষ কর্তৃক আল্লাহকৃত হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করার বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। নিঃসন্দেহে এটা একটি বড় ধরনের কুফরী তথা হারাম কাজ। আর একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে হালাল ও হারাম করার অধিকার আছে বলে বিশ্বাস করা বড় শির্ক। জাহেলী তথা অনৈসলামী আইন-কানুন দ্বারা পরিচালিত বিচারালয়ের নিকট সন্তুষ্টচিত্তে, স্বেচ্ছায় ও বৈধজ্ঞানে বিচার প্রার্থনা করা এবং এরূপ বিচার প্রার্থনার বৈধতা আছে বলে আক্বীদা পোষণ করাও বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা এই বড় শির্ক সম্পর্কে বলেছেন,

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ﴾ (التوبة: ٣١)

অর্থঃ "আল্লাহর পরিবর্তে তারা তাদের আলেম ও সাধু-দরবেশদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে"(তাওবা,৩১)। আদী বিন হাতেম (রাঃ) আল্লাহর নাবীকে এ আয়াত পাঠ করতে শুনে বলেছিলেন, (إِنَّهُمْ لَمْ يَكُوْنُوا يَعْبُدُوْنَهُمْ) অর্থঃ "ওরাতো ওদের ইবাদত করে না"। একথা রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) শুনে বলেছিলেন,

" أَجَلْ وَلَكِنْ يُحِلُّوْنَ لَهُمْ مَا حَرَّمَ اللهُ فَيَسْتَحِلُّوْنَهُ وَيُحَرِّمُوْنَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّ اللهُ فَيُحَرِّمُوْنَهُ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ "(البيهقي, السنن الكبرى ١١٦/١٠ ...)

অর্থঃ "তা বটে। কিন্তু আল্লাহ যা হারাম করে দিয়েছেন তারা ওদেরকে তা হালাল করে দিলে ওরা তা হালালই মনে করে। একইভাবে আল্লাহ যা হালাল করে দিয়েছেন-তারা ওদেরকে তা হারাম করে দিলে ওরা তাকে হারামই মনে করে। এটাই হলো তাদের ইবাদত করা"। (বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ১০/১১৬ পৃষ্ঠা, তিরমিযী হা/৩০৯৫, হাদীছ হাসান,আলবানী, গায়াতুল মারাম,পৃঃ১৯)।

মহান আল্লাহ মুশরিকদের আচরণ বর্ণনা করতে যেয়ে বলেছেন,

﴿وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ﴾ (التوبة: ٢٩)

অর্থঃ "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) যা হারাম করে দিয়েছেন, তারা তাকে হারাম বলে গণ্য করেনা আর তারা সত্য দ্বীনকে তাদের দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করেনা" (তাওবা,২৯)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُوْنَ﴾ (يونس: ٥٩)

অর্থঃ "(হে রাসূল! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)) আপনি বলে দিন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে রূযী দান করেছেন, তার মধ্য হতে তোমরা কতকগুলিকে হারাম আর কতকগুলিকে হালাল করে নিয়েছ, তা কি তোমরা কোনদিন

ভেবে দেখেছ? (হে রাসূল! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)) আপনি বলে দিন, আল্লাহ কি তোমাদেরকে এ সমস্ত বিষয়ে কোন অনুমতি দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহর নামে এসব মনগড়া কথা বলছ"? (ইউনুছ,৫৯)। (বর্তমানে অনেক মুসলিম দেশে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি মানব রচিত মতবাদের স্বার্থে কুরআন ও সুন্নাহকে সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে আইন পরিষদে এমন সব আইন পাশ করা হচ্ছে। যার ফলে আল্লাহর দেওয়া বহু হারাম নির্দেশকে হালালে পরিণত করা হচ্ছে এমনিভাবে বহু হালাল নির্দেশকে হারামে পরিণত করা হচ্ছে। যেমন মদ-জুয়া, বেশ্যাবৃত্তি, লটারী, সুদ-ঘুষ ইত্যাদিকে সরকারী অনুমতি অর্থাৎ লাইসেন্সের মাধ্যমে বৈধ করা হচ্ছে। অথচ ইসলামী শরী'য়াতে এগুলি কঠোরভাবে হারাম ঘোষিত হয়েছে। অপরদিকে ইসলামী শরী'য়াত মুতাবিক রাষ্ট্র পরিচালনা, ইসলামী ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ ইত্যাদি হালাল ও জরুরী বিষয়কে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ সকল আইন প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকজনের অধিকাংশই নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করে। আর যাদের উপর আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে তারাও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম। তারা কেউ ইসলাম বিরোধী এসব আইনের প্রতিবাদ করে না, বরং স্বাচ্ছন্দে এগুলি গ্রহণ করে নিচ্ছে। পরিশেষে এ প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, উল্লিখিত বর্ণনার আলোকে আমরা কোন্ ধরনের মুসলমান?- অনুবাদক)।

৯. আল্লাহ যেসব বস্তুতে যে কল্যাণ রাখেন নি তাতে সে কল্যাণ থাকার আক্বীদা পোষণ করা

(اِعْتِقَادُ النَّفْعِ فِي أَشْيَاءَ لَمْ يَجْعَلْهَا الْخَالِقُ كَذَلِكَ)

অল্লাহ তা'আলা এই আসমান ও যমীন এবং উভয়ের মধ্যেকার যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তিনি যে কল্যাণ যে বস্তুর ভিতর রাখেননি, ঐ বস্তু সেই উপকার করতে পারে বলে অনেকে স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে বিশ্বাস করে। এরূপ বিশ্বাস শির্কের পর্যায়ভুক্ত। যেমন বহু লোক তাবীয-কবয, শিরকী ঝাড়-ফুঁক, বিভিন্ন প্রকার সূতা বা তাগা এবং বিভিন্ন প্রকার পাথর ব্যবহার করে থাকে। তাদের বিশ্বাস যে, এতে কোন রোগ ব্যাধি কাছে ভিড়তে পারে না। আর যদি কোন রোগ হয়েই থাকে তবে এগুলি ব্যবহার করলে সুস্থতা ফিরে আসবে। মূলত এগুলি ব্যবহারের পিছনে গণক, যাদুকর প্রমুখ শ্রেণীর পরামর্শ আর যুগ যুগ ধরে চলে আসা জাহেলী রসম-রেওয়ায ও প্রথা কাজ করছে।

অনেকেই মানুষের বদ নযর প্রতিরোধ করার জন্য ছোট ছেলে-মেয়েদের এবং বড়দের গলায় এসব ঝুলিয়ে থাকে, শরীরের অন্য জায়গায়ও বেঁধে রাখে। গাড়ী ও বাড়ীতেও এমনিভাবে তাবীয ও দু'আ-কালাম লিখিত কাগজ ঝুলিয়ে রাখার প্রচলন দেখা যায়। এতে গাড়ী-বাড়ী সবই দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে যায় বলে তাদের বিশ্বাস।

অনেকে আবার রোগের হাত থেকে বেঁচে থাকার জন্য কিংবা রোগ যাতে হ'তে না পারে সে জন্য কয়েক প্রকার ধাতু নির্মিত আংটি ব্যবহার করে থাকে। এর ফলে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল অর্থাৎ ভরসা কমে যায় আর হারাম জিনিস দ্বারা চিকিৎসার প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায়। এসব তাবীযের অনেকগুলিতেই স্পষ্ট শিরকী কথা, জিনের নিকট ফরিয়াদ, সূক্ষ্ম আঁকা-বাঁকা রেখা ও অবোধ্য কথা লেখা থাকে। অনেক জ্ঞানপাপী শির্কী কথা ও মন্ত্র-তন্ত্রের সাথে কুর'আনের আয়াত মিশিয়ে দেয়। আর কেউ কেউ নাপাক দ্রব্য যেমন ঋতুস্রাবের রক্ত ইত্যাদি দিয়েও তাবীয লেখে। এ ধরণের তাবীয, তাগা, আংটি ঝুলানো কিংবা বাঁধা স্পষ্ট শির্ক তথা হারাম। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ"(أحمد ١٥٦/٤, الباني سلسلة صحيحة ح/٤٩٢)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো বা ঝুলালো নিশ্চয়ই সে আল্লাহর সাথে শির্ক করল" (আহমাদ ৪/১৫৬, আলবানী সিলসিলা ছহীহা হাদীছ নং ৪৯২)। যে তাবীয ব্যবহার করে এ বিশ্বাস নিয়ে যে, এসব জিনিস আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়াই উপকার কিংবা অপকার করতে পারে, তাহলে সে বড় শির্ক করার দোষে দোষী হবে। আর যদি সে বিশ্বাস করে যে, এ গুলি উপকার বা অপকারের একটি ওয়াসীলা মাত্র। অথচ আল্লাহ তা'আলা এ গুলিকে রোগ নিরাময়ের জন্য কোন ওয়াসীলা হিসাবে নির্ধারণ করেন নি, সে ক্ষেত্রে সে ছোট গুনাহ করার দোষে দোষী হবে। আর তখন এটা শির্কে মিলিত হওয়ার অন্যতম কারণ হিসাবে গণ্য হবে।

১০. লোক দেখানো ইবাদত (اَلرِّيَاءُ فِي الْعِبَادَةِ)

আল্লাহ তা'আলার নিকট মানুষের সকল প্রকার ইবাদত-বন্দেগী ক্বাবুল হওয়ার জন্য অন্যতম ২টি শর্ত।

১. ইবাদত খালেছ ভাবে আল্লাহর জন্যে হ'তে হবে অর্থাৎ রিয়া বা লৌকিকতা মুক্ত হ'তে হবে।

২. ইবাদত কুর'আন ও সুন্নাহ মুতাবিক অর্থাৎ পবিত্র কুর'আন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে হ'তে হবে। যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য অর্থাৎ মানুষকে খুশি করার উদ্দেশ্যে ইবাদত করবে, সে ছোট শিরক করার অপরাধে অপরাধী হবে, আর তার সৎ আমল সবই নষ্ট হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوْا كُسَالَى يُرَآؤُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلَّا قَلِيْلًا﴾ (النساء: ١٤٢)

অর্থঃ "নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে, অথচ আল্লাহ তা'আলাও তাদের সাথে প্রতারণা করেন। যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন তারা অলসতার সাথে দাঁড়ায়। তারা মানুষদেরকে দেখায় যে– তারা নামায আদায় করছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মহান আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে" (আন-নিসা : ১৪২)। নিজের সুনাম, সুখ্যাতি ও কাজের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ুক, আর লোকেরা দেখে ও শুনে বাহবা দিক– এ ধরনের নিয়্যেত নিয়ে যে কাজ করবে, সে অবশ্যই শির্কে পতিত হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। এরূপ আকাঙ্ক্ষাকারী ব্যক্তিদের সম্পর্কে ইসলামী শরী'য়াতে কঠোর হুঁশিয়ারী বাণী উচ্চারিত

হয়েছে। যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهِ وَ مَنْ رَاءَىٰ رَاءَىٰ اللّٰهُ بِهِ"

অর্থঃ "যে ব্যক্তি মানুষকে শুনানোর জন্য কোন কাজ করে, আল্লাহ তা'আলা এর বদলে মানুষকে শুনিয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন কাজ করবে– আল্লাহ তা'আলা এর বদলে মানুষদেরকে দেখিয়ে দিবেন" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ সব লোকদেরকে কঠিন শাস্তি দিবেন (মুসলিম)। যে ব্যক্তি একই সাথে আল্লাহ ও মানুষদেরকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইবাদত করবে, তার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে হাদীছে কুদসীতে এসেছে, মহান আল্লাহ বলেছেন,

" أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِيْ غَيْرِيْ تَرَكْتُهُ وَ شِرْكَهُ" (مسلم ح/٢٩٢٥)

অর্থঃ "আমি আল্লাহ সকল অংশীস্থাপনকারীদের শির্ক তথা অংশীস্থাপন থেকে সবচেয়ে বেশী অমুখাপেক্ষী। যে কেউ এমন আমল করল যে, তাতে আমার সাথে অন্য কাউকে অংশী স্থাপন করল– এমতাবস্থায় আমি তাকে এবং তার আমল উভয়কে বর্জন করে থাকি" (ছহীহ মুসলিম হাদীছ নং ২৯৮৫)।

তবে কেউ কোন আমল শুরু করার পর যদি তার মধ্যে লোক দেখানো ভাব জাগ্রত হয়, আর সে তা ঘৃণা করে এবং তা থেকে সে সরে আসতে চেষ্টা করে– তাহ'লে তার ঐ আমল শুদ্ধ হবে। কিন্তু যদি সে তা না করে, বরং লোক দেখানো ভাব মনে উদয় হওয়ার জন্য শান্তি ও আনন্দ অনুভব করে, তাহ'লে অধিকাংশ আলিমদের মতে তার ঐ আমল সব বাতিল হয়ে যাবে।

১১. অশুভ আলামত গ্রহণ করা (الطِّيَرَةُ)

অশুভ আলামত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوْا بِمُوْسَى وَمَنْ مَعَهُ﴾ (الأعراف:١٣١) অর্থঃ "যখন তাদের (ফের'আউন ও তার প্রজাদের) কোন কল্যাণ দেখা দিত তখন তারা বলত, এটা আমাদের জন্য হয়েছে। আর যখন কোন অকল্যাণ দেখা দিত, তখন তারা মূসা ও তাঁর সাথীদেরকে এই অশুভ আলামতের কারণ হিসাবে গণ্য করত" (আল-আ'রাফ,১৩১)। আরবের মুশরিকরা যাত্রা ইত্যাদি কাজের প্রথমে পাখি উড়িয়ে দিয়ে তার মাধ্যমে শুভাশুভ নির্ণয় করত। পাখি উড়ে ডাইনে গেলে শুভ মনে করে সে কাজে তারা নেমে পড়ত। আর পাখি উড়ে বামে গেলে তাকে অশুভ মনে করে সে কাজ থেকে বিরত থাকত। এভাবে শুভাশুভ নির্ণয়ের বিধান প্রসঙ্গে মহানবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেন, "اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ" অর্থ "অশুভ আলামতে বিশ্বাস করা শির্ক" (মুসলিম, হাদীছ নং ২৯৮৫)।

মাস, দিন, সংখ্যা, নাম ও প্রতিবন্ধী ইত্যাদিকে দুর্ভাগ্য বা অশুভ প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করাও তাওহীদ পরিপন্থী হারাম আক্বীদার অন্তর্ভুক্ত। যেমন অনেক দেশে হিজরী সনের সফর মাসকে ও প্রতি মাসের শেষ বুধবারকে চিরস্থায়ী অশুভ আলামত মনে করা হয়। বিশ্বজুড়ে আজ ১৩ সংখ্যাকে 'অশুভ ১৩' বা Unlucky thirteen বলা হয়। আর কেউ যদি ১৩ ক্রমিক নম্বর একবার পড়ে যায় তাহ'লে তার দুশ্চিন্তার আর সীমা থাকে না। অনেকে কানা-খোড়া, পাগল ইত্যাদি প্রতিবন্ধীদেরকে কোন কাজের শুরুতে দেখতে পেলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে।

অনেকেরই দোকান খুলতে গিয়ে এমনিধরণের কোন কানা-খোঁড়াকে দেখতে পেলে তার আর দোকান খোলা হয় না। অথচ এজাতীয় আক্বীদা পোষণ করা শিরক তথা হারাম। এজন্য যারা অশুভ আলামতে বিশ্বাসী– রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) তাদেরকে তাঁর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেননি। এমর্মে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ وَلاَ تُطُيِّرَلَهُ وَلاَ تَكَهَّنَ وَلاَ تُكُهِّنَ لَهُ (وَأَظُنُّهُ قَالَ) أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ" (الطبراني, كبير ١٦٢/١٨, صحيح الجامع ح/٥٤٣٥).

অর্থঃ "যে ব্যক্তি অশুভ আলামতে বিশ্বাস করে এবং যার জন্য অশুভ আলামতের প্রতি বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। আর যে ব্যক্তি ভাগ্য গণনা করে এবং যার জন্য ভাগ্য গণনা করা হয় (বর্ণনাকারী মনে করেন যে, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আরোও বলেছিলেন যে,) অথবা যে ব্যক্তি যাদু করে আর যার কারণে যাদু করা হয় সেই সমস্ত ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়" (ত্বাবারানী, কাবীর ১৮/১৬২, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৫৪৩৫)।

প্রকাশ থাকে যে, কেউ কোন বিষয়ে অশুভ আলামত গ্রহণ করে থাকলে তাকে অবশ্যই এজন্যে কাফফারা আদায় করতে হবে। কাফফারা বলতে এখানে কোন অর্থ বা টাকা-পয়সা কিংবা ইবাদত নয়; বরং পাপ মোচনকারী একটি দু'আ– যা আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) একদা বলেছিলেন যে, "যদি অশুভ আলামত কোন ব্যক্তিকে কোন কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে, তাহলে নিশ্চয়ই সে শির্ক করল। এ কথা শুনে ছাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)

তাহ'লে তার কাফফারা কী হবে? উত্তরে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছিলেন, ঐ ব্যক্তি বলবে,

"اَللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ" (احمد ٢٢٠/٢, سلسله صحيحه ح/١٠٦٥).

উচ্চারণ ঃ 'আল্লাহুম্মা লা-খায়রা ইল্লা-খায়রুকা অ লা-ত্বিয়ারা ইল্লা ত্বিয়ারুকা অলা- ইলা-হা গায়রুকা'। অর্থঃ "হে আল্লাহ! আপনার কল্যাণ ছাড়া আর কোন কল্যাণ নেই। আর আপনার সৃষ্ট অশুভ আলামত ছাড়া আর কোন অশুভ আলামত নেই। আর একমাত্র আপনি ছাড়া আর কোন সত্যিকার উপাস্য নেই" (আহমাদ ২/২২০, সিলসিলা ছহীহা হাদীছ ১০৬৫)।

তবে শুভ আলামত ও অশুভ আলামতের ধারণা মানুষের মনে জন্ম নেয়া এটা মানুষের স্বভাবগত ব্যাপার, যা কোন সময় বাড়ে আর কোন সময় কমে। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা হলোঃ মহান আল্লাহর উপর পূর্ণভাবে তাওয়াক্কুল করা অর্থাৎ ভরসা করা। যেমন এ প্রসঙ্গে ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেছেন,

"وَمَا مِنَّا إِلاَّ (أَىْ إِلاَّ وَيَقَعُ فِيْ نَفْسِهِ شَيْءٌ مِّنْ ذَلِكَ) وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ" (أبوداود ح/ ٣٩١٠, سلسله صحيحه ح/ ٤٣٠).

অর্থঃ "আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, যার মনে অশুভ আলামত সংক্রান্ত বিষয়ে কোন কিছুই উঁকি দেয় না। কিন্তু তাওয়াক্কুল (একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা এর) দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তা দূর করে দেন" (আবূ-দাঊদ হাদীছ নং ৩৯১০, সিলসিলা ছহীহাহ হাদীছ নং ৪৩০)।

১২. খাতির জমানোর জন্য মুনাফিক ও ফাসিকদের সঙ্গে উঠাবসা করা

(اَلْجُلُوْسُ مَعَ الْمُنَافِقِيْنَ أَوِ الْفُسَّاقِ اِسْتِئْنَاسًا بِهِمْ أَوْ إِيْنَاسًا لَهُمْ)

দুর্বল ঈমানের অনেক মানুষই পাপাচারী ও দুষ্কৃতিকারীদের সঙ্গে ইচ্ছাকৃতভাবে উঠাবসা করে থাকে। এমনকি আল্লাহর দ্বীন এবং তাঁর অনুসারীদের প্রতি যারা অহরহ বিদ্রুপ করে, তাদের সঙ্গেও তারা দহরম-মহরম ও সম্পর্ক রেখে চলে। এমনকি অনেকেই তাদের সাথে উঠাবসা, চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া ও আত্মীয়তা সবই করে থাকে। অথচ এসমস্ত কাজগুলি যে একজন পরহেযগার ঈমানদার ব্যক্তির জন্য হারাম তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوْضُوْا فِي حَدِيْثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ﴾ (الأنعام:٦٨)

অর্থঃ "(হে মুহাম্মাদ! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)) যখন আপনি তাদেরকে আমার কোন আয়াত বা বিধান সম্পর্কে উপহাসমূলক আলোচনায় মগ্ন দেখতে পান– তখন আপনি তাদের থেকে দূরে সরে থাকুন, যে পর্যন্ত না তারা অন্য বিষয়ে আলোচনা শুরু করে। আর যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেয়, তাহ'লে স্মরণে আসার পর যালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপনি আর বসবেন না" (আনআম,৬৮)।

অতএব ফাসিক ও মুনাফিকদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক যত গভীরই হৌক কিংবা তাদের সাথে সমাজ করাতে যত মজাই

লাগুক আর তাদের কথা-বার্তা যত মধুর হৌক না কেন– তাদের সাথে উঠাবসা করা একজন সত্যিকার পরহেযগার মুসলমানের জন্য কোন রকমেই জায়েয নয়।

তবে হাঁ, যে ব্যক্তি তাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত প্রদান করে, তাদের বাতিল আক্বীদার প্রতিবাদ করে কিংবা তাদেরকে অন্যায় থেকে নিষেধ করার জন্য তাদের নিকট যাতায়াত করে– তাহলে সে উক্ত নির্দেশের আওতাভুক্ত হবে না। স্বেচ্ছায়, খুশীমনে ও কোন কিছু না বলে নীরবে তাদের সাথে মিলেমিশে থাকাটা বড় পাপের কাজ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ﴾ (التوبة:٩٦)

অর্থঃ "(হে ঈমানদারগণ! ঐ সমস্ত মুনাফিকরা) তারা তোমাদের নিকট শপথ করবে যাতে তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও। তবে যদি তোমরা তাদের (ঐ সমস্ত ফাসিকদের) প্রতি সন্তুষ্ট থাক তবে (জেনে রেখ) মহান আল্লাহ ফাসিক বা দুস্কৃতিকারী সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না" (আত-তাওবাহ,৯৬)।

১৩. নামাযে ধীরস্থিরতা পরিহার করা

(تَرْكُ الطُّمَأْنِيْنَةِ فِي الصَّلَاةِ)

সবচেয়ে বড় চুরি হচ্ছে নামাযে চুরি করা। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

"أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِيْ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ وَ كَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ ؟ قَالَ لاَ يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلاَ سُجُوْدَهَا" (أحمد ٥/٣١٠, صحيح الجامع ح/٧٢٢٤)

অর্থঃ "সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর সেই ব্যক্তি যে ছালাতে চুরি করে। এ কথা শুনে ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সে কিভাবে নামাযে চুরি করে? উত্তরে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বললেন, সে নামাযে রুকু-সিজদা ঠিকমত করে না" (আহমাদ ৫/৩১০, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৯৯৭)। আজকাল অধিকাংশ মুছল্লীকে দেখা যায় যে- তারা নামাযে ধীরস্থিরতার ভাব বজায় রাখে না। ধীরস্থিরভাবে রুকু-সিজদা করে না। রুকু থেকে যখন মাথা উচু করে তখন পিঠ সোজা করে দাঁড়ায় না আর দু'সিজদার মাঝে পিঠ টান করে সোজা হয়ে বসে না। বর্তমান সমাজে খুব কম মাসজিদই এমন পাওয়া যাবে যে- সেখানে এজাতীয় দু'চার জন পাওয়া যাবে না। অথচ নামাযে ধীরস্থিরতা বজায় রাখা ফরয। ইচ্ছাকৃতভাবে তা পরিত্যাগ করলে নামায মোটেই শুদ্ধ হবে না। অতএব এ ব্যাপারটি খুব লক্ষ্যণীয় বিষয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"لاَ تُجْزِئُ صَلاَةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيْمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ"

(أبوداود ١/٥٣٣, صحيح الجامع ح/٧٢٢٤).

অর্থঃ "কোন নামাযী ব্যক্তি যে পর্যন্ত না রুকু-সিজদায় তার পিঠ সোজা করবে, সে পর্যন্ত তার নামায যথাযথভাবে আদায় হবে না" (আবূ-দাউদ ১/৫৩৩, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৭২২৪)। উল্লিখিত কাজটি যে না জায়েয এতে কোন সন্দেহ

নেই। যে ব্যক্তি এভাবে নামায পড়ে সে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর হাদীছ অনুযায়ী নামায চোর হিসাবে গণ্য হবে। আবূ-আব্দুল্লাহ আল-আশ'আরী (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছে এসেছে যে, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) একদা ছাহাবীদের সাথে নামায আদায়ের পর তাদের একটি দলের সাথে বসেছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে নামাযে দাঁড়াল। সে তার নামাযের ভিতর রুকু করছিল আর সিজদায় গিয়ে যেন সে ঠোকর মারছিল। তার নামাযের এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বললেন, "তোমরা কি এই লোকটিকে লক্ষ্য করেছ? এভাবে নামায আদায় করে যদি কেউ মারা যায়- তাহ'লে সে মুহাম্মাদের মিল্লাত থেকে খারিজ হয়ে মারা যাবে। কাক যেমন রক্তে ঠোকর মারে- সে তেমনি করে তার নামাযে ঠোকর মারছে। আর যে ব্যক্তি রুকু করে আর সিজদায় গিয়ে ঠোকর মারে- তার দৃষ্টান্ত ঐ ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ন্যায়, যে একটি বা দু'টির বেশী খেজুর খেতে পায় না। দু'টি খেজুরে তার কতটুকু ক্ষুধা পুরা হ'তে পারে? (ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ ১/৩৩২, আলবানী ছিফাতু ছালাতিন নাবী, পৃঃ১৩১)।

যায়েদ বিন ওয়াহহাব হ'তে বর্ণিত আছে যে, একবার হুযায়ফা (রাঃ) এমন এক নামাযী ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন যে- সে তার নামাযে রুকু-সিজদা ঠিকমত আদায় করছে না। তিনি তাকে বললেন, তুমি নামায আদায় কর নাই। আর এ অবস্থায় যদি তুমি মৃত্যু বরণ কর- তাহ'লে যে দ্বীন সহ আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-কে পাঠিয়েছেন, তুমি তার বাইরে মৃত্যু বরণ করবে" (বুখারী, ফাতহুলবারী ২/২৭৪ পৃঃ)।

যে ব্যক্তি নামাযে ধীরস্থিরতা বজায় রাখে না, সে যখন তার বিধান জানতে পারবে– তখনকার ওয়াক্তের ফরয নামায তাকে পুনরায় পড়তে হবে। আর অতীতে এধরনের সমস্ত ভুলের জন্য তাকে খালেছ তাওবা করতে হবে, তবে সেই নামাযগুলি আর পুনরায় পড়তে হবে না। যেমন হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) একদিন মাসজিদে নববীতে এক ব্যক্তিকে খুব দ্রুত নামায আদায় করার পরে তাকে বলেছিলেন, "

إِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ" (مسلم)

অর্থঃ "তুমি ফিরে যেয়ে পুনরায় নামায আদায় কর, কেননা তুমি নামায আদায় কর নাই। আর তোমরা সে ভাবেই নামায আদায় করবে– যে ভাবে তোমরা আমাকে নামায আদায় করতে দেখো" (মুসলিম, ছালাত অধ্যায়)। এখানে লক্ষণীয় যে, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) ঐ ছাহাবীকে তার আদায়কৃত নামায পুনরায় আদায় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন– কিন্তু ঐ ছাহাবীর পূর্বের নামায পুনরায় কাযা করার কথা রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) তাকে বলেন নি।

১৪. নামাযের ভিতর বিনা প্রয়োজনে

কোন কাজ করা এবং বেশী বেশী নড়াচড়া করা

(اَلْعَبَثُ وَكَثْرَةُ الْحَرَكَةِ فِي الصَّلَاةِ)

নামাযের ভিতর বিনা প্রয়োজনে কোন কাজ করা এবং বেশী বেশী নড়াচড়া করা এমন এক খারাপ অভ্যাস, যা থেকে অনেক মুছল্লীই বিরত থাকতে পারে না। কারণ তারা নিম্নে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের প্রতি মোটেই খেয়াল করে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ﴾ অর্থঃ "তোমরা আল্লাহর জন্য অনুগত হয়ে দাঁড়াও" (আল-বাক্বারাহ, ২৩৮)। মহান আল্লাহ আরো বলেছেন,

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ – الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ﴾ (المؤمنون:١–٢)

অর্থঃ "নিশ্চয়ই সেই সকল মু'মিন বান্দা সফলকাম হবে, যারা নিজেদের নামাযে বিনীত থাকে" (আল-মু'মিনূন, ১-২)। কিন্তু উক্ত লোকেরা আল্লাহ তা'আলার এ কথার মর্মার্থ বুঝে না। তাই তারা তাদের নামাযের ভিতরে স্থিরতা ও মনোনিবেশের পরিবর্তে অনেক কিছুই তারা করে থাকে। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-কে সিজদার মধ্যে মাটি সমান করা যাবে কিনা জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি উত্তরে বলেছিলেন

"لَا تَمْسَحْ وَأَنْتَ تُصَلِّيْ فَإِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةٌ تَسْوِيَةَ الْحَصَى" (مسلم, أبوداود ٥٨١/١ ,صحيح الجامع ح/٧٤٥٢).

অর্থঃ "নামায অবস্থায় তুমি কিছু মুছতে পারবে না। একান্তই যদি প্রয়োজনে কিছু করতে হয় তাহ'লে (সিজদার স্থান থেকে) কংকরাদি মাত্র একবার সরিয়ে দিতে পারবে" (মুসলিম, আবূদাঊদ ১/৫৮১, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৭৪৫২)।

আলেমগণ বলেছেন, নামাযের ভিতর বিনা প্রয়োজনে বেশী মাত্রায় একাধারে নড়াচড়া করলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। অতএব যারা নামাযে বিনা কারণে বেশী নড়াচড়া ও খেলায় মেতে উঠে তাদের অবস্থা কেমন হ'তে পারে একবার চিন্তার বিষয়। তাদেরতো দেখা যায়, তারা আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছে। অথচ কেউ ঘড়ির টাইম ঠিক করছে কিংবা কেউ কাপড় ঠিকঠাক

করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, অথবা কেউ আঙ্গুল দিয়ে নাক পরিষ্কার করছে। অনেকে আবার নামাযে দাঁড়িয়ে ডানে-বামে, সামনে ও উপরের দিকে তাকাতে থাকে। অথচ এই অপরাধের ফলে আল্লাহ তা'আলা যে তাদের চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দিতে পারেন কিংবা শয়তান তাদের নামাযে তাদের মনোযোগ নষ্ট করে দিতে পারে– এ সম্পর্কে তাদের মনে কোনই চিন্তা নেই।

১৫. নামাযে ইচ্ছাকৃতভাবে ইমামের আগে মুক্তাদির গমন করা

(سَبْقُ الْمَأْمُومِ إِمَامَهُ فِي الصَّلاَةِ عَمْدًا)

যে কোন কাজে তাড়াহুড়া করা অধিকাংশ মানুষের জন্মগত স্বভাব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُوْلاً﴾ অর্থঃ "মানুষ খুবই দ্রুততা প্রিয়" (বানী ইসরাইল, ১১)। আর এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"اَلتَّأنِّي مِنَ اللهِ وَ الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيَاطِيْنِ" (بيهقي, سنن الكبرى ١٠/١٠٤, سلسلة الصحيحة ح/١٧٩٥) অর্থঃ "ধীরস্থিরতা আল্লাহর পক্ষ হ'তে, আর তাড়াহুড়া করা শয়তানের পক্ষ হ'তে" (বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা ১০/১০৪ পৃঃ, সিলসিলা ছহীহাহ হাদীছ নং ১৭৯৫)।

নামাযের জামা'আতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ডানে-বামে অনেক মুছল্লী ইমামের রুকু-সিজদায় যাওয়ার আগেই রুকু-সিজদায় চলে যাচ্ছে। নামাযে উঠা-বসার তাকবীর গুলিতে তো

এটা প্রায় দেখা যায়। এমনকি অনেকেই নামাযে সালাম ফিরানোর সময় ইমামের আগেই সালাম ফিরিয়ে ফেলে। এ বিষয়টিকে অনেকেই গুরুত্ব দেয়না বা খেয়ালই করে না। অথচ রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এ বিষয়ে কঠোর শাস্তির হুমকি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন,

"أَمَا يَخْشَى الَّذِىْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ" (مسلم ١/٣٢٠)

অর্থঃ "সাবধান! যে ব্যক্তি নামাযে ইমামের আগে আগে (রুকু ও সিজদা হ'তে) মাথা উঠায়, তার কি ভয় হয় না যে–এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তার মাথাকে গাধার মাথার দ্বারা পরিবর্তন করে দিতে পারেন" (মুসলিম ১/৩২০পৃঃ)। হাদীছে যেখানে একজন মুছল্লীকে ধীরস্থিরভাবে নামাযে উপস্থিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে– আর খুব তাড়াতাড়ি বা দ্রুতভাবে নামাযের জন্য মাসজিদের দিকে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তাহলে নামায যে ধীরস্থিরভাবে, শান্তিপূর্ণভাবে এবং পূর্ণ মনোনিবেশের সাথে আদায় করতে হবে– এ বিষয়ে কারো সন্দেহ থাকার কথা নয়। আবার অনেক মুছল্লীকে দেখা যায় যে, তারা নামাযে ইমাম সাহেবের রুকু-সিজদায় উঠাবসা করার পরে বেশ কিছু দেরী করে উঠাবসা করে এটাও সুন্নাতের খেলাফ। আর একারণেই মুজতাহিদগণ এ ব্যাপারে সুন্দর একটি নিয়ম উল্লেখ করেছেন। নিয়মটি হলোঃ ইমাম যখন নামাযের ভিতর যে কোন তাকবীর শেষ করবেন মুক্তাদীগণ তখন নড়াচড়া শুরু করবেন। যেমন ইমাম 'আল্লাহু আকবার' এর 'র' বর্ণ উচ্চারণ করা মাত্রই মুক্তাদী রুকু-সিজদায় যাওয়ার জন্য মাথা নীচু করা শুরু করবে। অনুরূপভাবে রুকু হ'তে মাথা উঠানোর সময় ইমামের

'সামিআল্লা-হুলিমান হামিদাহ' এর 'হ' বর্ণ উচ্চারণ শেষ হ'লে মুক্তাদী মাথা উঠাবে।

ছাহাবীগণ যাতে নামাযের ভিতর রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর আগে চলে না যান সে বিষয়ে তাঁরা খুবই সতর্ক ও সচেষ্ট থাকতেন। বারা বিন আযিব (রাঃ) বলেন, ছাহাবীগণ রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর পিছনে নামায পড়তেন। যখন তিনি রুকু হ'তে মাথা উঠাতেন, তখন আমি এমন একজনকেও দেখিনি যে, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর কপাল মাটিতে রাখার আগে তাঁরা সিজদায় যাওয়ার জন্য তাদের পিঠ বাঁকা করেছেন। তিনি পূর্ণভাবে সিজদায় চলে গেলে পরে ছাহাবীরা সিজদায় যেতেন" (ছহীহ মুসলিম হাদীছ নং ৪৭৪)।

নবী কারীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) যখন বৃদ্ধ হয়ে যান এবং তাঁর নড়াচড়ায় যখন মন্থরতা দেখা যায় অর্থাৎ তাঁর চলাফেরার গতি যখন কিছুটা কমে যায় তখন তিনি তাঁর পিছনের মুক্তাদীদেরকে এ কথা বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে,

"يَاَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ قَدْ بَدَّنْتُ فَلاَ تَسْبِقُوْنِيْ بِالرُّكُوْعِ وَ السُّجُوْدِ"

অর্থঃ "হে লোকেরা! এখন আমার দেহ ভারী হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা রুকু-সিজদায় আমার আগে চলে যেও না" (বায়হাক্বী ২/৯৩, হাদীছ হাসান, ইরওয়াউল গালীল ২/২৯০)। অপরদিকে ইমামকেও নামাযের তাকবীর সমূহে সুন্নাত মুতাবিক আমল করা জরুরী।

এ সম্পর্কে আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছে এসেছে,

"كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ,... ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِىْ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَالِكَ فِي الصَّلاَةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوْسِ" (بخارى ح/٧٥٦).

অর্থঃ "রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন শুরুতে তিনি তাকবীর বলতেন। তারপর যখন তিনি রুকুতে যেতেন তখন তাকবীর বলতেন। যখন তিনি সিজদায় যেতেন তখন তাকবীর বলতেন। এর পর যখন তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন তখন তিনি তাকবীর বলতেন। অতঃপর যখন তিনি দ্বিতীয় সিজদায় যেতেন তখন তিনি তাকবীর বলতেন। এরপর সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময় তিনি তাকবীর বলতেন। এভাবে নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাকবীর বলতেন। আর দ্বিতীয় রাক'আতের বৈঠক শেষ করে দাঁড়ানোর সময়ও তিনি তাকবীর বলতেন"(ছহীহ বুখারী হাদীছ নং ৭৫৬)।

সুতরাং এভাবে ইমাম যখন নামাযে উঠা-বসার সঙ্গে তার তাকবীরকে উচ্চ আওয়াযে মুখে উচ্চারণ করবে, অপরদিকে মুক্তাদীগণও ইমাম সাহেবের তাকবীরধ্বনি শুনে নামাযের রুকু-সিজদায় ইমাম সাহেবের উঠা-বসার সাথে সাথে নয় বরং ইমাম সাহেবের উঠা-বসার পরে পরে ইমাম সাহেবকে অনুসরণ করতে থাকবে- তখন ইমাম ও মুক্তাদী উভয়েরই নামাযে উঠা-বসা সুন্নাত মুতাবিক আদায় হয়ে যাবে।

১৬. পিঁয়াজ-রসুন কিংবা দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস খেয়ে মসজিদে গমন করা

(إِتْيَانُ الْمَسْجِدِ لِمَنْ أَكَلَ بَصَلاً أَوْ ثُوْمًا أَوْ مَالَهُ رَائِحَةٌ كَرِيْهَةٌ)

কাঁচা পিঁয়াজ, কাঁচা রসুন, সিগারেট ও বিড়ি খেলে মুখে এমন দুর্গন্ধ হয় যে– তার নিকটে অবস্থান করা বড় কষ্টকর হয়ে পড়ে। ফলে তার দ্বারা মাসজিদের পূত-পবিত্র পরিবেশ কলুষিত হয়, আর মাসজিদের স্নিগ্ধতা কমে যায়। অথচ এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿يَابَنِيْ آدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾

অর্থঃ "হে বানী আদম! অর্থাৎ আদম সন্তান তোমরা প্রতি নামাযের সময় তোমাদের সৌন্দর্যকে ধারণ কর"(আল-আ'রাফ ৩১)। অর্থাৎ তোমরা সুন্দর পোশাক পরিধান করে মাসজিদে এসো আর মাসজিদের শান্তিময় পরিবেশ বজায় রেখো । কেননা যে কোন ধরণের দুর্গন্ধ মাসজিদের শান্তিময় পরিবেশকে নষ্ট করে ফেলে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) জাবির (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে বলেছেন,

"مَنْ أَكَلَ ثُوْمًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ قَالَ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ"

অর্থঃ "যে ব্যক্তি রসুন অথবা পিয়াজ খাবে, সে যেন আমাদের থেকে দূরে থাকে। অথবা তিনি বলেছেন, সে যেন আমাদের মাসজিদ থেকে দূরে থাকে আর নিজ বাড়ীতে বসে থাকে" (বুখারী, ফাতহুল বারী ২/৩৩৯) রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আরো বলেছেন,

"مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَ الثَّوْمَ وَ الْكُرَّاثَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُوْ آدَمَ" (مسلم)

অর্থঃ যে ব্যক্তি পিঁয়াজ, রসুন ও কুর্রাছ (অর্থাৎ কুর্রাছ বা কার্রাছ এক প্রকার গন্ধযুক্ত শব্জী, যার পাতা গুলি দেখতে অনেকটা পিঁয়াজ ও রসুনের পাতার মত। অনেকেই এটাকে ভাতের সাথে কাঁচা খায়, আর অনেকেই এটাকে তরকারীর সাথে রান্না করে খায়, আর সাধারণতঃ এটাকে সিংগাড়া ও মুগলাই পরটার ভিতরে ভরে ভাজি করে খাওয়া হয়- অনুবাদক) খাবে সে যেন কখনই আমাদের মাসজিদে না আসে। কেননা বানী আদম যে জিনিসে কষ্ট পায় আল্লাহর ফিরিশতারাও সে জিনিসে কষ্ট পায়"(মুসলিম ১/৩৯৬)।

উমার ফারুক্ব (রাঃ) একদা জুম'আর খুৎবায় বলেছিলেন, হে লোক সকল তোমরা দু'টি গাছ খেয়ে থাক। আমি ঐ দু'টিকে ঘৃনীত, জঘন্য বা হারাম ছাড়া অন্য কিছু মনে করি না। সে দু'টি গাছ হচ্ছে পিঁয়াজ ও রসুন। কেননা আমি রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-কে দেখেছি, কারো মুখ থেকে তিনি এ দু'টির গন্ধ পেলে তাকে মাসজিদ থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দিতেন। ফলে তাকে বের করে দেওয়া হ'ত। সুতরাং কেউ যদি উহা খেতে চায়– তাহলে সে যেন তা পাকিয়ে খায়"(মুসলিম ১/৩৯৬)। অনেকেই কাজ-কর্ম শেষ করে সঙ্গে সঙ্গে উযূ করে নিজের শরীর ভালভাবে ঠাণ্ডা হওয়ার আগেই মাসজিদে ঢুকে পড়ে। এ দিকে তার শরীরের ঘাম ভাল করে না শুকানোর কারণে বিশেষ করে তার বগল ও মোযা দিয়ে দুর্গন্ধ বের হ'তে থাকে। এধরনের লোকও উক্ত বিধানের আওতায় পড়বে। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো ধূমপায়ীরা। তারা হারাম

ধূমপান করতে করতে মুখে চরম দুর্গন্ধ জন্মিয়ে নেয়। এ অবস্থায় মাসজিদে ঢুকে তারা আল্লাহর বান্দা মুছল্লীদেরকে ও ফিরিশতাদেরকে কষ্ট দিয়ে থাকে।

১৭. যিনা-ব্যভিচার করা (اَلزِّنَا)

নিঃসন্দেহে বংশ,সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষা করা ইসলামী শরী'য়াতের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আর এ জন্যেই ইসলামী শরী'য়াত যিনা-ব্যভিচারকে চিরতরে হারাম করে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا﴾ (الإسراء:٣٢)

অর্থঃ "তোমরা যিনা-ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়োনা। নিশ্চয়ই তা একটি অশ্লীল কাজ ও খারাপ পন্থা" (বানী ইসরাইল, ৩২)। ইসলামী শরী'য়াত 'পর্দাকে' ফরয করে দিয়েছে, নারী-পুরুষ উভয়কে দৃষ্টি সংযত রাখতে বলেছে আর অনাত্মীয়া স্ত্রীলোকদের সাথে নির্জনে মিলিত হওয়াকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। এভাবে ইসলামী শরী'য়াতে যিনা-ব্যভিচারের সকল দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এ সত্ত্বেও কেউ যিনা-ব্যভিচার করে বসলে তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়ার বিধান রয়েছে। বিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে পাথর মেরে মেরে শেষ করতে হবে। যাতে করে সে তার কুকর্মের উপযুক্ত ফলাফল ভোগ করতে পারে আর হারাম কাজে তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন করে মজা উপভোগ করেছিল—এখন তেমনি করে ঠিক তার উল্টা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। আর অবিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীদেরকে ১০০ (একশত) বেত্রাঘাত করতে হবে। আর বেত্রাঘাতের ক্ষেত্রে এটাই ইসলামী শরী'য়াতের সর্বোচ্চ শাস্তি। একদল মু'মিন বান্দাদের সামনে অর্থাৎ বহু জনতার সামনে খোলা ময়দানে এ শাস্তি কার্যকর করতে হবে, যাতে সে চরমভাবে

অপমানিত হয়। একই সাথে ১বৎসরের জন্য অপরাধ সংঘটিত এলাকা থেকে তাকে তাড়িয়ে দিতে হবে। ইসলামী শরী'য়াতের এ সুন্দরতম ব্যবস্থা দেশে ও সারা বিশ্বে চালু হ'লে যিনা ব্যভিচারের মাত্রা প্রায় শূন্যের কোঠায়' নেমে আসবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

ব্যভিচারী নর-নারী পরকালীন জীবন তথা 'বারযাখ জগতে'ও (মৃত্যুর পর থেকে ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মানুষ যে জগতে অবস্থান করবে তাকে 'বারযাখ জগত' বলে) কঠিন শাস্তি পেতে থাকবে। তারা এমন একটি অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে থাকবে যার উপরের অংশ হবে সংকীর্ণ আর নীচের অংশ হবে প্রশস্ত। তার নীচ থেকে আগুন জ্বালানো হবে। আর সেই আগুনের মধ্যে তারা উলঙ্গ, বিবস্ত্র অবস্থায় জ্বলতে থাকবে আর যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকবে। ঐ আগুন এতই উত্তপ্ত হবে যে, যার তোড়ে তারা উপরের দিকে উঠে আসবে। এমনকি তারা ঐ অগ্নিকুণ্ড হ'তে প্রায় বেরিয়ে আসার নিকটবর্তী হয়ে যাবে। আর যখনই এমন হবে তখনই আগুন নিভিয়ে দেয়া হবে। ফলে তারা আবার অগ্নিকুণ্ডের তলদেশে ফিরে যাবে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদের এভাবে আযাব হ'তেই থাকবে।

ব্যভিচারের বিষয়টি আরো জঘন্য ও ঘৃণিত হয়ে দাঁড়ায় তখন, যখন কোন বৃদ্ধ ব্যক্তি যার এক পা ক্ববরে চলে যাওয়ার পরেও যিনা-ব্যভিচার করতেই থাকে। এব্যাপারে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আবূ-হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে বলেছেন,

"ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَ مَلِكٌ كَذَّابٌ وَ عَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ" (مسلم ١٠٢/١).

অর্থঃ "ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা ৩ ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না; বরং তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা হলো বৃদ্ধ

ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী রাষ্ট্রপতি আর অহংকারী দরিদ্র" (মুসলিম ১/১০২ পৃঃ)।

অনেকে ব্যভিচার বা পতিতাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে। অথচ পতিতাবৃত্তি থেকে উপার্জিত আয় একেতো হারাম– অপরদিকে নিকৃষ্ট উপার্জনের মধ্য হ'তে একটি। যে পতিতা তার ইযযত বেচে খায়– মধ্যরাতে যখন দু'আ ক্ববূলের জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়, তখন দু'আ ক্ববূল হওয়া থেকে সে বঞ্চিত হয়" (ছহীহুল জামে হাদীছ নং ২৯৭১)। মোট কথা অভাব ও দরিদ্রতার দোহাই দিয়ে আল্লাহ তা'আলার বিধান লংঘন করে এ ধরনের পাপকাজে লিপ্ত হওয়া কোন রকমেই শারয়ী ওযর বা যুক্তি সঙ্গত কারণ হ'তে পারে না।

আমাদের যুগে তথা বর্তমান যুগে যিনা-ব্যভিচার ও অশ্লীলতার সকল দুয়ার খুলে দেয়া হয়েছে। শয়তান ও তার দোসরদের চক্রান্তে যিনা-ব্যভিচার ও অশ্লীলতার পথ ও মাধ্যমগুলি সাধারণ জনগণের জন্যেও সহজলভ্য হয়ে গেছে। পাপী ও দুস্কৃতিকারীরা এখন খুলাখুলিভাবে শয়তানের অনুসরণ করে চলেছে। মেয়েরা দ্বিধাহীন চিত্তে ব্যাপকভাবে বাইরে যাতায়াত করছে। তারা দেশ-বিদেশে বেড়াতে যাচ্ছে। রাস্তা-ঘাটে শহরে-বন্দরে, স্কুল-কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে বখাটে ছেলেদের বক্র চাহনি, হাঁ করে মেয়েদের পানে তাকিয়ে থাকা এবং মেয়েদেরকে উত্ত্যক্ত করা এটাতো বর্তমান নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া অবাধ মেলা-মেশা,পর্ণ-পত্রিকা ও ব্লু ফিল্মে দেশ ভরে গেছে। ফ্রি সেক্সের দেশগুলিতে মানুষের ভ্রমণের পরিমাণ ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। কে কত বেশী খোলামেলা হ'তে পারে বর্তমানে যেন তারই প্রতিযোগিতা চলছে। ধর্ষণ ও বলৎকারে দেশ ছেয়ে যাচ্ছে। জারয তথা হারাম সন্তানের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ক্লিনিকে বিভিন্ন পদ্ধতির (এম,আর) নামে অবৈধ গর্ভপাতের মাধ্যমে মানব সন্তানদের হত্যা করা হচ্ছে।

হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট দয়া, অনুগ্রহ ও দোষ-ত্রুটির গোপনীয়তা প্রার্থনা করছি এবং এমন সম্ভ্রম কামনা করছি যার বদৌলতে তুমি আমাদেরকে সকল অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করবে। আমরা তোমার নিকট আমাদের মনের পবিত্রতা ও ইযযতের হিফাযত প্রার্থনা করছি। দয়া করে তুমি আমাদের মাঝে ও হারামের মাঝে একটি পর্দা তৈরী করে দাও। আমীন!

১৮. পুংমৈথুন বা সমকামিতা

(اَللِّوَاطُ)

অতীতে হযরত লূত (আঃ) এর জাতি সমকামিতায় অভ্যস্ত ছিল। তাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ - أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ﴾ (العنكبوت:٢٨-٢٩)

অর্থঃ "(হে মুহাম্মাদ! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)) আপনি লূত (আঃ) এর কথা স্মরণ করুন! যখন তিনি তার কওমকে বলেছিলেন, তোমরা নিশ্চয়ই এমন অশ্লীল কাজ করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে আর কেউ করেনি। আর তোমরাই তো (সমকামিতার উদ্দেশ্য নিয়ে) পুরুষদের কাছে আসছ, তোমরাই তো রাহাজানি করছ, আর তোমরাই তো ভরা মাজলিসে অন্যায় কাজ করছ"(আন-কাবূত,২৮- ২৯)।

যেহেতু এই অন্যায় ছিল জঘন্য, অত্যন্ত মারাত্মক ও ঘৃণিত তাই আল্লাহ তা'আলা লূত (আঃ) এর জাতির উপরে একেবারেই ৪ প্রকারের শাস্তি চাপিয়ে দিয়েছিলেন। এ জাতীয় এতগুলি শাস্তি

একেবারে অন্য কোন জাতিকে ভোগ করতে হয়নি। ঐ শাস্তিগুলি ছিলঃ (১) তাদের চক্ষু উৎপাটন করা (২) জমিনের উপরিভাগকে নীচে করে দেয়া (৩) অবিরাম পাথর বর্ষণ করা (৪) হঠাৎ ধ্বংসের আগমন।

সমকামিতার শাস্তি হিসাবে ইসলামী শরী'আতের পণ্ডিতগণের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মত হলোঃ স্বেচ্ছায় মৈথুনকারী ও মৈথুনকৃত ব্যক্তি উভয়কেই তরবারীর আঘাতে শিরশ্ছেদ করতে হবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوْا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ" (أحمد ١/٣٠٠, صحيح الجامع ح/٦٥٦٥)

অর্থঃ "তোমরা লূতের সম্প্রদায়ের মত সমকামিতার কাজ কাউকে করতে দেখলে মৈথুনকারী ও মৈথুনকৃত উভয়কেই হত্যা করবে"(আহমাদ ১/৩০০, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৬৫৬৫)। মৈথুন বা সমকামিতার প্রাকৃতিক কুফলও কম নয়। এসব নির্লজ্জ বেহায়াপনার কারণেই আমাদের যুগে এমন কিছু রোগ-ব্যাধি মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে যা পূর্বকালে ছিল না। বর্তমান পৃথিবীতে মহাভয়ংকর 'এইডস' রোগ তার জ্বলন্ত উদাহরণ। 'এইডস' প্রমাণ করে যে, এই ঘৃণিত ও জঘন্য পাপকাজ তথা 'সমকামিতা' কে প্রতিরোধ করার জন্য ইসলামের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা ঠিকই যুক্তি সঙ্গত হয়েছে।

১৯. শার'ঈ ওযর ছাড়া স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর শয্যা গ্রহণ করতে অস্বীকার করা

(إِمْتِنَاعُ الْمَرْأَةِ مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ شَرْعِيٍّ)

আবূ-হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"إِذَا دَعَا الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانٌ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ" (بخارى, فتح البارى ٦/٣١٤).

অর্থঃ "অনেক মহিলাকেই দেখা যায় যে, স্বামী-স্ত্রীতে একটু খুটি-নাটি কিছু হলেই স্বামীকে কিছুটা শাস্তি প্রদান বা জব্দ করার উদ্দেশ্যে স্ত্রী তার স্বামীর সঙ্গে দৈহিক মেলামেশা বন্ধ করে বসে। এর ফলে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অনেক রকম অশান্তি দেখা দেয়। পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি হয়। স্বামী দৈহিক তৃপ্তির জন্য কখনো অবৈধ পথও বেছে নেয়। আর অনেক সময় অন্য স্ত্রী গ্রহণের চিন্তাও তার মাথায় জেগে উঠে। এভাবে বিষয়টি কোন কোন সময় বিপদ জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে। অতএব স্ত্রীর কর্তব্য হবে স্বামী তাকে বিছানায় ডাকা মাত্রই স্বামীর ডাকে সাড়া দেওয়া। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"إِذَا دَعَا الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْتُجِبْ وَإِنْ كَانَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ" (زوائد البزار ٢/١٨١, صحيح الجامع ح/٥٤٧).

অর্থঃ "যখন কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে তার সঙ্গে দৈহিক মিলনের জন্য ডাকবে, তখনই যেন সেই মহিলা তার স্বামীর ডাকে সাড়া দেয়, যদিও ঐ মহিলা (রান্না বান্নার কাজে জ্বলন্ত

চুলার পাশে কাজে ব্যস্ত থাকুক না কেন" (যাওয়াদুল বায্যার ২/১৮১, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৫৪৭)।

স্বামীরও কর্তব্য হবে, স্ত্রী রোগাক্রান্ত, গর্ভবতী কিংবা অন্য কোন অসুবিধায় পতিত হ'লে তার অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখা। এর ফলে তাদের স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা বজায় থাকবে আর কোন সময় পরস্পরের মাঝে মনোমালিন্য সৃষ্টি হবে না।

২০. শার'ঈ কারণ ছাড়া স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর নিকট তালাক প্রার্থনা করা

(طَلَبُ الْمَرْأَةِ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا لِغَيْرِ سَبَبٍ)

এমন অনেক স্ত্রীলোক আছে যারা স্বামীর সঙ্গে সম্প্রীতির একটু অভাব ঘটলেই কিংবা তার চাওয়া পাওয়ার একটু ত্রুটি হ'লেই স্বামীর নিকট তালাক দাবী করে। অনেক সময় স্ত্রী তার নিকট আত্মীয় কিংবা প্রতিবেশী কর্তৃক এরূপ বিপদজনক কাজে অগ্রসর হয়ে থাকে। কখনো সে তার স্বামীকে লক্ষ্য করে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ থেকে শুরু করে এমন এমন আত্ম মর্যাদা হানিকর কথা বলে যা শুনে অধিকাংশ পুরুষই ধৈর্য ধারণ করতে পারে না। যেমন সে বলে, তুমি যদি পুরুষ লোক হয়ে থাকো তাহ'লে তুমি আমাকে তালাক দাও। কিন্তু তালাকের যে কী বিষময় ফল তা সবারই জানা আছে। তালাকের কারণে একটি পরিবারে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়। সন্তানেরা সব ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। আর এজন্যে অনেক সময় স্ত্রীর মনে অনুশোচনা জাগতে পারে। কিন্তু তখন তো আর করার কিছুই থাকে না। আর এসব কারণেই

ইসলামী শরী'আত সামান্য ব্যপারে কথায় কথায় তালাক প্রার্থনাকে হারাম করে দিয়ে মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনকে রক্ষা করার ব্যাপারে যে সুন্দরতম বিধান মানুষের কল্যাণার্থে উপহার দিয়েছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) ছাওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে পরিষ্কারভাবে বলেছেন,

"أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَابَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ" (أحمد ٥/٢٧٧, صحيح الجامع ح/ ٢٧٠٣).

অর্থঃ "কোন মহিলা যদি বিনা দোষে তার স্বামীর নিকট তালাক প্রার্থনা করে- তাহ'লে একারণে জান্নাতের সুগন্ধি তার জন্য হারাম হয়ে যাবে"(আহমাদ ৫/২৭৭, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ২৭০৩)। উক্ববা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আরো বলেছেন,

"إِنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ وَ الْمُنْتَزِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ" (الطبراني, كبير ١٧/٣٣٩, صحيح الجامع ح/١٩٣٤).

অর্থঃ "খোলাকারিণী ও সম্পর্ক ছিন্নকারিণী রমণীগণ মুনাফিক" (ত্বাবারানী, কাবীর ১৭/৩৩৯, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ১৯৩৪)। তবে হাঁ, যদি কোন শার'ঈ ওযর থাকে যেমন- স্বামী নামায পড়ে না। অথবা সে অনবরত মদ-তাড়ি, গাঁজা ও হিরোইন খেয়ে অধিকাংশ সময় নিশাগ্রস্ত থাকে, কিংবা সে স্ত্রীকে হারাম বা ফাহেশাহ কাজের জন্য বাধ্য করে, কিংবা সে স্ত্রীকে অন্যায়ভাবে মারধর করে, কিংবা সে তার স্ত্রীর শার'ঈ অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করে... ইত্যাদি। এ সমস্ত বিষয়ে যথাসাধ্য নছীহত করেও স্বামীকে ফিরানো যাচ্ছে না এবং সংশোধনেরও

কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না– এ ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর নিকট তালাক দাবী করলে কোন দোষ হবে না। বরং এ ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আতের উপর মজবুত থাকার উদ্দেশ্যে এবং শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করার তাগিদে স্ত্রী তার স্বামীর নিকট তালাকের দাবী করতে পারবে। আর প্রকৃত পক্ষে ইসলামী শরী'আত নারীদেরকে এ ধরনের অধিকার দিয়ে নারীদের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে দিয়েছে।

২১. যিহার (الظِّهَار)

'যিহার'এর অর্থঃ নিজের স্ত্রীকে অথবা তার কোন অঙ্গকে 'মা'এর সাথে অথবা 'স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম' এমন কোন মহিলার পৃষ্ঠদেশের সমতুল্য বলে আখ্যায়িত করাকে আরবীতে 'যিহার' বলা হয়। এ কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, মায়ের সাথে মেলা-মেশা যেমন ইসলামী শরী'য়াতে হারাম, ঠিক এমনিভাবে স্ত্রীর সাথেও মেলামেশাকে হারাম করা। ভারতীয় উপমহাদেশে এই যিহারের প্রচলন খুব একটা দেখা যায় না। বিশেষ করে আরবে জাহেলী যুগ হতে এই যিহার প্রথা চলে আসছে। জাহেলী যুগে যিহারকে তালাক বলে গণ্য করা হতো। এই 'যিহার'এর পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার আর কোন অবকাশ ছিল না। কিন্তু ইসলামী বিধানে 'যিহার' দ্বারা তালাক হয় না, কেবল কাফ্ফারা ফরয হয়। কাফ্ফারা পরিশোধ না করা পর্যন্ত স্ত্রী সাময়িকভাবে স্বামীর জন্য নিষিদ্ধ থাকে। কাফফারা পরিশোধের পর স্বামীর জন্য স্ত্রীর সাথে যথাযথভাবে ঘর-সংসার করা হালাল হয়ে যায়।

জাহেলী যুগ থেকে চলে আসা যে সমস্ত রসম-রেওয়াজ উম্মাতে মুহাম্মাদীর ভিতরে প্রবেশ করেছে 'যিহার' তার মধ্য থেকে একটি। যে সব শব্দের দ্বারা 'যিহার' গণ্য করা হয় তার

কতকগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হলো। যেমন, স্বামী স্ত্রীকে বলবে, তুমি আমার নিকট আমার মায়ের পিঠের সমতুল্য। আমার বোন যেমন আমার জন্য হারাম তুমিও তেমনি আমার জন্য হারাম। তোমার শরীরের এক চতুর্থ অংশ আমার জন্য আমার ধাত্রীমায়ের মত হারাম ইত্যাদি। যিহারের মাধ্যমে নারীদের উপর বড় যুলুম ও অত্যাচার করা হয়। প্রকৃত পক্ষে যিহার একটি অমানবিক কাজ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿الَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَائِهِمْ مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ﴾ (المجادلة:٢)

অর্থঃ "তোমাদের মধ্য হ'তে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সঙ্গে যিহার করে তারা যেন জেনে রাখে যে, তারা তাদের মা নয়। তাদের মা তো তারাই যারা তাদেরকে প্রসব করেছে। তারা তো কেবল অবৈধ ও মিথ্যা কথা বলে। আর নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মার্জনাকারী" (আল-মুজাদালাহ, ২)।

'ইসলামী শরী'য়াত' রামাযান মাসে দিনের বেলায় কেউ স্বেচ্ছায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে রোযা ভঙ্গের কাফ্ফারা, এমনিভাবে ভুলক্রমে হত্যার কাফফারা যেভাবে দিতে বলেছে– যিহারের জন্যেও ঠিক একইভাবে কাফ্ফারা আদায় করতে বলেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَالَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ – فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَّتَمَاسَّا فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّيْنَ

مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (المجادلة:٣-٤)

অর্থঃ "যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, তারপর তারা তাদের উক্তি ফিরিয়ে নেয়, তাদের জন্য একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একজন দাস মুক্তির বিধান দেয়া হলো। এটা তোমাদের জন্য নির্দেশ। আর তোমরা যা কিছুই করনা কেন, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সবই জানেন। এ ছাড়া যে ব্যক্তি গোলাম অর্থাৎ দাস আজাদ করার ক্ষমতা রাখে না– তারজন্য একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটানা ২মাস রোযা রাখতে হবে। আর যে ব্যক্তি এটারও সামর্থ্য রাখে না, তাহ'লে তাকে ৬০জন মিসকিন অর্থাৎ গরীব মানুষকে খানা খাওয়াতে হবে। এই বিধান এ জন্য যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপরে তোমরা ঈমান রাখ। এটা আল্লাহর সীমারেখা। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি" (আল-মুজাদালাহ,৩-৪)।

২২. স্ত্রীর মাসিক অবস্থায় তার সাথে সহবাস করা

(وَطْءُ الزَّوْجَةِ فِي حَيْضِهَا)

স্ত্রীর মাসিক অবস্থায় তার সাথে সহবাস করা কুরআন ও হাদীছ উভয়ের আলোকেই নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (البقرة:٢٢٢)

অর্থঃ "(হে মুহাম্মাদ! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)) তারা আপনাকে মেয়েদের মাসিক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, তা গুনাহের কাজ। অতএব মেয়েদের মাসিকের সময় তোমরা তাদের থেকে দূরে থাক। আর তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত (সহবাসের উদ্দেশ্যে) তাদের নিকট তোমরা যেও না" (আল-বাক্বারাহ,২২২)। মেয়েদের মাসিক থেকে পবিত্রতা লাভের পর তারা গোসল না করা পর্যন্ত সহবাসের উদ্দেশ্যে তাদের নিকট পুরুষদের যাওয়া জায়েয নয়। কেননা এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (البقرة:٢٢٢)

অর্থঃ "যখন মেয়েরা তাদের মাসিক থেকে ভালভাবে পাক পবিত্র হয়ে যাবে তখন তোমরা তাদের নিকটে আল্লাহর নির্দেশ মোতাবিক (সহবাসের উদ্দেশ্যে) আগমন করবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তওবাকারীদেরকে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভাল বাসেন"(আল-বাক্বারাহ, ২২২)। আর এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ" (مسلم، مشكاة ح/٥٤٥)

অর্থঃ "(মেয়েদের মাসিক অবস্থায়) তোমরা তাদের সাথে সহবাস ব্যতীত বাকী সবকিছুই করতে পারবে" (মুসলিম, মিশকাত হাদীছ নং ৫৪৫, 'মাসিক' পরিচ্ছেদ)।

মেয়েদের মাসিক অবস্থায় তাদের সাথে সহবাস করা যে কঠিন পাপ, তা রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর নিম্ন বর্ণিত হাদীছ হ'তে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ إِمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ" (ترمذي صحيح الجامع ح/٥٩١٨).

অর্থঃ "যে ব্যক্তি কোন ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় কিংবা কোন মহিলার পিছনের রাস্তায় সঙ্গম করে অথবা (ভাগ্যের ভাল-মন্দ জানার জন্য) কোন গণকের কাছে যায়, তাহ'লে নিশ্চয়ই সে আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাকে (অর্থাৎ কুরআন মাজীদকে) অস্বীকার করল" (তিরমিযী, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৫৯১৮)।

এখন কথা হলো– যদি কোন ব্যক্তি না জেনে বা না বুঝে মাসিক অবস্থায় তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়– তাহ'লে তাকে এজন্য কোন কাফফারা দিতে হবে না। কিন্তু জেনে শুনে যারা এ কাজ করবে, তাদেরকে নির্ধারিত অর্ধ দিনার কাফ্ফারা দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে। (তিরমিযী, আবূদাঊদ, নাসায়ী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হাদীছ নং ৫৫৩)।

২৩. স্ত্রীর পিছনের রাস্তা দিয়ে সঙ্গম করা

(إِتْيَانُ الْمَرْأَةِ فِيْ دُبُرِهَا)

অনেক কাফের ও মুশরিক আর দুর্বল ঈমানের কিছু মুসলমান ভাইয়েরা তাদের স্ত্রীদের পিছনের রাস্তা দিয়ে মেলামেশা করে। অথচ এটা ইসলামী শরী'আতে বড় গোনাহের কাজ হিসাবে পরিচিত। যারা এ কাজ করে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) তাদের উপর অভিসম্পাত বা বদদু'আ করেছেন। আবূ-হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"مَلْعُوْنٌ مَنْ أَتَى إِمْرَأَةً فِيْ دُبُرِهَا" (أحمد ٤٧٩/٢, صحيح الجامع ح/٥٨٦٥).

অর্থঃ "যে পুরুষ স্ত্রীর পিছনের রাস্তা দিয়ে সঙ্গম করে সে অভিশপ্ত" (আহমাদ ২/৪৭৯, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৫৮৬৫)। পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে, যা রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় কিংবা কোন মহিলার পিছনের রাস্তায় সঙ্গম করে অথবা (ভাগ্যের ভাল-মন্দ জানার জন্য) কোন গণকের কাছে যায়, তাহ'লে নিশ্চয়ই সে আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাকে (অর্থাৎ কুরআন মাজীদকে) অস্বীকার করল" (তিরমিযী, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৫৯১৮)।

অবশ্য অনেক সতী-সাধ্বী স্ত্রী আছে– যারা তাদের স্বামীদেরকে এ কাজে বাধা দিয়ে থাকে। কিন্তু অনেক স্বামীই তাদের কথা স্ত্রী না মানলে তাদেরকে তালাকের হুমকি দিয়ে থাকে। আবার যে সকল স্ত্রী এ ব্যাপারে আলেমদের নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস করতে লজ্জা বোধ করে– এই সুযোগে তাদের স্বামীরা তাদেরকে প্রতারণামূলক ধারণা দিয়ে বলে যে, এ কাজ জায়েয আছে কোন অসুবিধা নেই।

কারণ আল্লাহ তা'আলা তো বলেছেন,

﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (البقرة:٢٢٣)

অর্থঃ "তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত স্বরূপ। অতএব তোমরা যে ভাবেই ইচ্ছা কর– সেভাবেই তোমরা তোমাদের ক্ষেতে আগমন করতে পার" (আল-বাক্বারা,২২৩)। অথচ নবী কারীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) উক্ত আয়াতের

ব্যাখ্যায় বলেছেন, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গমের উদ্দেশ্যে স্ত্রীর সামনের দিক থেকে অথবা তার পিছনের দিক থেকে যে কোন ভাবে সঙ্গম করতে পারবে, তবে শর্ত হলোঃ যতক্ষণ ঐ সঙ্গম মেয়েদের সন্তান প্রসবের রাস্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। আর এটা জানা কথা যে, মেয়েদের পিছনের রাস্তা দিয়ে সন্তান প্রসব হয় না। অতএব উল্লিখিত আয়াতে মেয়েদের সাথে সঙ্গম করার বিভিন্ন ক্ষেত্রের কথা বলা হয়নি, বরং একই ক্ষেত্রে বিভিন্ন কৌশল বা পদ্ধতির মধ্য হ'তে পুরুষদের মধ্যে যার যেটা ইচ্ছা সেটা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। নিঃসন্দেহে মেয়েদের পিছনের রাস্তা দিয়ে সঙ্গম করা স্পষ্ট হারাম কাজ। এ কাজে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই রাযী থাকলেও তা হারাম হবে। কেননা এ ধরণের কোন হারাম কাজ একে অপরের সম্মতিতে সংঘটিত হ'লেও সেটা কোন দিন হালাল হয় না। ইসলামী শরী'য়াতে যেটা হারাম কাজ সেটা হারামই।

সমাজে এ সমস্ত অপরাধমূলক বা হারাম কাজ সংঘটিত হওয়ার কতকগুলি মূল কারণ উল্লেখ করা হলোঃ

১. বৈবাহিক জীবনের কর্তব্য সম্পর্কে ইসলামী শরী'য়াতের বিধি-বিধান না জানা।

২. বিভিন্ন বিষয়ে গণক বা জ্যোতিষীদের কথা বিশ্বাস করার জাহেলী প্রথার অনুসরণ করা।

৩. ঘৃণিত রুচি চরিতার্থ বা কার্যকরী করার দুর্বার আশা ও আকাঙ্ক্ষা।

৪. যেখানে-সেখানে অর্থাৎ পত্র-পত্রিকায়, সিনেমা হলে, টেলিভিশন, ডিসেন্টেনা ও মুবাইলের

মাধ্যমে প্রচারিত ও প্রদর্শিত উলঙ্গ ও নির্লজ্জ নীল ছবিসমূহ দেখা আর সেই

সাথে অশ্লীল গানবাজনা শুনা।

৫. ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান, জার্মান, ইন্ডিয়া তথা অমুসলিমদের থেকে প্রচারিত

অশ্লীল গান-বাজনা, উলঙ্গ ব্লু ফ্লিম। মহান আল্লাহ রাব্বুল

আলামীন এ ধরনের হারাম কাজ থেকে আমাদেরকে দূরে থাকার পূর্ণ তাওফীক দান করুন আমীন।

২৪. স্ত্রীদের মাঝে সমতা রক্ষা না করা

(عَدْمُ الْعَدْلِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ)

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে পুরুষদেরকে নিজের স্ত্রীদের মাঝে সমতার বিধান কায়েম করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

﴿وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا أَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا﴾

(النساء:١٢٩)

অর্থঃ "তোমরা যতই আগ্রহ পোষণ কর না কেন তোমরা কখনোই তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে পারবে না। তবে তোমরা কোন একজন `স্ত্রীর প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না। আর অন্য স্ত্রীকে কোন প্রকারে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখ না। যদি তোমরা এ ব্যাপারে নিজেদেরকে সংশোধন কর আর সাবধান থাক, তাহ'লে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন ও তোমাদের উপর দয়া করবেন" (আন-

নিসা,১২৯)। এ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, রাত্রি যাপনে স্ত্রীদের মাঝে সমতা রক্ষা করা। পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক স্ত্রীর নিকটে ১ রাত করে যাপন করা। আর প্রত্যেক স্ত্রীর থাকা, খাওয়া ও পরার ব্যাপারে সমতার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তবে অন্তরের প্রেম-প্রীতি বা ভালবাসা সব স্ত্রীর জন্য সমান হ'তে হবে এমন বিধান ইসলামী শরী'আত কাউকে দেয়নি। কেননা স্বামীর প্রেম-প্রিতি বা ভালবাসাকে তার স্ত্রীদের মাঝে সমানভাবে ভাগ করে দেয়া এটা কোন মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।

এমন কিছু মানুষ আছে, যারা তাদের একাধিক স্ত্রীর মধ্য হ'তে কোন একজনকে নিয়ে সবসময় পড়ে থাকে, আর অন্যজনের প্রতি কোন খেয়ালই রাখে না। একজনের নিকট বেশী বেশী রাত কাটায় কিংবা বেশী খরচ করে, আর অন্যজনের ব্যাপারে কোন খোঁজ খবরই নেয়না। নিঃসন্দেহে এরূপ একপেশে আচরণ ইসলামী শরী'য়াতে হারাম। ক্বিয়ামত দিবসে এ সমস্ত লোকদের যে অবস্থা হবে তার একটি চিত্র আবূ-হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নিম্নলিখিত হাদীছে আমরা দেখতে পাই। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"مَنْ كَانَتْ لَهُ إِمْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ شِقُّهُ مَائِلٌ" (أبوداود ٢/٦٠١، صحيح الجامع ح/٦٤٩١). অর্থঃ "যে ব্যক্তির দু'জন স্ত্রী আছে, কিন্তু সে তাদের মধ্য হ'তে কোন একজনের প্রতি ঝুঁকে পড়ল– তাহ'লে এ কারণে সে কাল ক্বিয়ামতের মাঠে অর্ধাঙ্গ অবস্থায় উঠবে" (আবূ-দাঊদ ২/৬০১, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৬৪৯১)।

২৫.পরনারীর সাথে নির্জনে অবস্থান করা

(اَلْخَلْوَةُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ)

এ কথা চির সত্য যে, মানুষের মাঝে ফিৎনা ও অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য শয়তান সর্বদাই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কি ভাবে মানুষের দ্বারা হারাম কাজ করানো যায়, এ চিন্তা-ভাবনা নিয়েই শয়তান সব সময় ব্যস্ত থাকে। তাই মহান আল্লাহ শয়তানের প্ররোচনা থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে আমাদেরকে সতর্ক করার জন্য বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ (النور:٢١)

অর্থঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে ব্যক্তি শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে– শয়তান তাকে অশ্লীল ও অন্যায় কাজের হুকুম দিবে" (আন-নূর,২১)।

শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় চলাচল করার ক্ষমতা রাখে। কোন পুরুষকে কোন পরনারীর সাথে একাকী মিলিত হওয়া বা একাকী অবস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়ার মাধ্যমে অশ্লীল কাজ বা যিনা ব্যভিচারে লিপ্ত করে দেওয়া শয়তানের একটি বড় চক্রান্ত। আর এ জন্যেই ইসলামী শরী'আত অন্য মহিলার সাথে এভাবে একাকী চলা-ফেরা, উঠা-বসা ও অবস্থান করাকে হারাম করে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ" (ترمذي، مشكوة ح/٣١١٨).

অর্থঃ "কোন পুরুষ যখন একজন মহিলার সাথে নির্জনে মিলিত হয়, তখন তাদের তৃতীয় সঙ্গী হয় শয়তান" (তিরমিযী,

মিশকাত হাদীছ নং ৩১১৮)। ইবনু উমার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আরো বলেছেন,

"لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِيْ هَذَا عَلَى مُغِيْبَةٍ إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اِثْنَانِ"

(مسلم ٤/١٧١١).

অর্থঃ "আমার আজকের এই দিনের পর থেকে কোন পুরুষ একজন কিংবা দু'জন পুরুষকে সঙ্গে নেওয়া ব্যতীত কোন স্বামী থেকে দূরে থাকা মহিলার সাথে নির্জনে দেখা করতে পারবে না" (মুসলিম ১/১৭১১)।

অতএব স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি তথা যে কোন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হোক, আর বাড়ীর রুমেই হোক, কিংবা বাসে,ট্রেনে, প্লেনে, নৌকা, লঞ্চে আর জাহাজে অর্থাৎ যে কোন ধরনের যানবাহনেই হোক না কেন, কোথাও কোন পুরুষ লোক– বিবাহ বৈধ (যেমন, চাচাত, ফুফাতো, মামাতো, খালাতো বোনেরা, চাচী, মামী... ইত্যাদি) এমন কোন মহিলার সাথে একাকী থাকতে পারবে না। এমনিভাবে নিজের ভাবী, কাজের মেয়ে, কোন রোগিনী এ ধরনের কারো সাথেই নির্জনে সময় কাটানো বা একত্রে অবস্থান করা কোন রকমেই জায়েয নয়।

এ ছাড়া এমন অনেক মানুষ আছে– যারা আত্মবিশ্বাসের বলে হোক কিংবা দ্বিতীয় পক্ষের উপর নির্ভর করেই হোক উল্লিখিত মহিলাদের সাথে একাকী অবস্থান করে নিজেদেরকে খুব উদার মনোভাবের অধিকারী বলে দাবী করে থাকে। তারা এভাবে খোলা মেলাভাবে মেলামেশাকে কোন খারাপই মনে করে না। অথচ এরই মধ্য দিয়ে যতসব যিনা-ব্যভিচারের সূত্রপাত হয়, সমাজ দেহ কলুষিত হয় আর সমাজে জারজ সন্তান তথা অবৈধ সন্তানের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যায়।

২৬. বিবাহ বৈধ এমন মহিলার সাথে মুছাফাহা করা

(مُصَافَحَةُ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ)

বর্তমান সমাজে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা খুব বেড়েই চলেছে। ফলে অনেক নারী-পুরুষই বর্তমানে নিজেদেরকে আধুনিক হিসাবে প্রকাশ করার জন্য ইসলামী শরী'য়াতের সীমালংঘন করে একে অপরের হাত ধরে মুছাফাহা করছে। তাদের ভাষায় এটা হ্যাণ্ডশেক বা করমর্দন। আল্লাহর নিষেধকে অমান্য করে বিকৃত রুচি ও নগ্ন সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ করতে যেয়ে তারা একাজ করেই চলেছে, আর নিজেদেরকে প্রগতিবাদী দাবী করছে। আপনি তাদেরকে যতই বুঝান না কেন, আর তাদেরকে দলীল প্রমাণ যতই দেখান না কেন– তারা তা কখনোই মানবে না। উল্টো তারা আপনাকে প্রতিক্রিয়াশীল, সন্দেহবাদী, আত্মীয়তা ছিন্নকারী ইত্যাদি বিশেষণে আখ্যায়িত করবে। আর চাচাত বোন, ফুফাত বোন, মামাত বোন, খালাত বোন, ভাবী, চাচী, মামী... ইত্যাদি আত্মীয়দের সঙ্গে মুছাফাহা করা তো তাদের নিকট পানি পান করার চেয়েও সহজ কাজ। অথচ শরী'য়াতের দৃষ্টিতে কাজটা কত ভয়াবহ তা যদি তারা একবার গভীরভাবে চিন্তা করত বা দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখত তাহ'লে কখনোই তারা এ কাজ করতে পারত না। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"لَأَنْ يُطْعَنَ فِيْ رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِّنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَنْ يَّمَسَّ اِمْرَأَةً لَاتَحِلُّ لَهُ" (طبراني ٢٠/٢١٢,صحيح الجامع ح/٤٩٢١).

অর্থঃ "নিশ্চয়ই তোমাদের কারো মাথায় লোহার পেরেক ঠুকে দেয়া ঐ মহিলাকে স্পর্শ করা থেকে অনেক ভাল, যে তার জন্য হালাল নয়" (ত্বাবারানী ২০/২১২, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৪৯২১)। নিঃসন্দেহে এটা হাতের যিনা। যেমন রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

"اَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَالرِّجْلاَنِ تَزْنِيَانِ وَالْفَرْجُ يَزْنِي" (أحمد ٤١٢/١، صحيح الجامع ح/٤١٢٦).

অর্থঃ "দুই চোখ যিনা করে, দুই হাত যিনা করে, দুই পা যিনা করে, আর লজ্জাস্থানও যিনা করে" (আহমাদ ১/৪১২, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৪১২৬)। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) থেকে পবিত্র মনের মানুষ দুনিয়ায় আর কেউ নেই, অথচ তিনি বলেছেন, "وَإِنِّيْ لاَ أُصَافِحُ إِمْرَأَةً" অর্থঃ "আমি মেয়েদের সাথে মুছাফাহা করি না" (আহমাদ ৬/৩৫৮, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ২৫০৯)। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আরো বলেছেন,

" إِنِّيْ لاَ أَمَسُّ أَيْدِى النِّسَاءِ" (طبراني كبير ٣٤٢/٢٤، صحيح الجامع ح/٧٠٥٤).

অর্থঃ "আমি মেয়েদের হাত স্পর্শ করি না" (ত্বাবারানী কবীর ২৪/৩৪২, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৭০৫৪)। এ প্রসঙ্গে মা আয়েশা (রাঃ) বলেছেন,

"لاَ وَاللهِ مَامَسَّتْ يَدُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ إِمْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلاَمِ" (مسلم ١٤٧٩/٣).

অর্থঃ "আল্লাহর শপথ, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর হাত কখনোই কোন বেগানা নারীর হাত স্পর্শ করেনি। তিনি কথার মাধ্যমে তাদেরকে বায়'আত করাতেন" (মুসলিম ৩/১৪৭৯)।

অতএব আধুনিকতা তথা ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টানদের সাথে তাল মিলাতে যেয়ে যারা নিজেদের বন্ধুদের সাথে মুছাফাহা না করলে তাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দেয়ার হুমকি দেয়– তারা যেন এ ব্যাপারে হুঁশিয়ার থাকে। এছাড়া জানা আবশ্যক যে, মুছাফাহা কোন আবরণের সাহায্যে হোক বা আবরণ ছাড়াই হোক দুই অবস্থাতেই অন্য পুরুষের সাথে মেয়েদের মুছাফাহা করা হারাম।

২৭. সুগন্ধি মেখে মেয়েদের বাড়ীর বাইরে যাওয়া আর পুরুষদের মাঝে চলাফেরা করা

(تَطَيُّبُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ خُرُوْجِهَا وَمُرُوْرِهَا بِعِطْرِهَا عَلَى الرِّجَالِ)

আজকাল আতর, সেন্ট, স্নো, পাউডার ইত্যাদি নানা প্রকার সুগন্ধি মেখে মেয়েরা ঘরে-বাইরে পুরুষদের মাঝে ব্যাপকভাবে চলাফেরা করছে। অথচ মহানবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এ বিষয়ে খুব কঠোরভাবে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন,

"أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوْا رِيْحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ" (أحمد ٤١٨/٤، صحيح الجامع ح/١٠٥).

অর্থঃ "পুরুষেরা গন্ধ পাবে এমন উদ্দেশ্যে আতর বা সুগন্ধি মেখে কোন মহিলা যদি পুরুষদের মাঝে চলাফেরা করে– তাহলে

সে একজন যিনাকারী মহিলা হিসাবে গণ্য হবে" (আহমাদ ৪/৪১৮, ছহীহুল জামে হাদীছ ১০৫)।

অনেক মহিলা তো এ ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন, আর অনেকেই তো এ বিষয়টিকে খুব হালকাভাবে গ্রহণ করে। যে সমস্ত মেয়েরা সেজেগুজে বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধি মেখে ড্রাইভারের সাথে গাড়ীতে চলাফেরা করছে, দোকানে যাচ্ছে, স্কুল-কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে, তারা শরী'আতের নিষেধাজ্ঞার দিকে সামান্যতমও খেয়াল করে না। মেয়েদের ঘরের বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে ইসলামী শরী'আত এমন কঠোর বিধান আরোপ করেছে যে, বাড়ীর বাইরে যাওয়ার সময় মেয়েরা সুগন্ধি মেখে থাকলে– ঐ সুগন্ধিকে নাপাকী মনে করে ফরয গোসলের ন্যায় ঐ মহিলাকে গোসল করতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لِيُوْجَدَ رِيْحُهَا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ اغْتِسَالَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ" (أحمد ٢/٤٤٤, صحيح الجامع ح/٢٧٠٣).

অর্থঃ "যে মহিলা গায়ে সুগন্ধি মেখে মাসজিদের দিকে বের হয় এ জন্য যে, তার শরীরের সুবাস বা ঘ্রাণ পাওয়া যাবে, তাহ'লে তার নামায ততক্ষণ পর্যন্ত গৃহীত হবে না– যতক্ষণ না সে নাপাকী দূর করার জন্য ফরয গোসলের ন্যায় গোসল না করবে" (আহমাদ ২/৪৪৪, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ২৭০৩)।

বর্তমান যুগে হাটে-বাজারে, কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে, বিভিন্ন অফিস-আদালতে আর যানবাহনাদিতে নানা ধরনের মানুষের সমাবেশে তথা সর্বত্র মহিলারা যে সুগন্ধিযুক্ত প্রসাধনী যেমন আতর, সেন্ট, আগর, ধূনা, চন্দনকাঠের আতর ইত্যাদি মেখে

যাতায়াত করছে তার বিরুদ্ধে একমাত্র মহান আল্লাহর কাছেই আমাদের সকল অভিযোগ। আল্লাহর নিকটে আমাদের সমস্ত প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের উপর রাগান্বিত না হন। ঐ সমস্ত নাফরমান নর-নারীর কর্মের জন্য তিনি যেন সৎ লোকদেরকে পাকড়াও না করেন। আর মহান আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে জান্নাতের পথে চলার পূর্ণ তাওফীক্ব দান করেন। আমীন।

২৮. কোন মাহরাম আত্মীয় ছাড়া মহিলাদের একাকী সফর করা

(سَفَرُ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন, لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِيْ "مَحْرَمٍ" অর্থঃ "যে পুরুষকে চিরতরে বিবাহ করা হারাম এমন কোন পুরুষ আত্মীয়কে সাথে না নিয়ে যেন কোন মহিলা একাকী ভ্রমণ না করে"

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হাদীছ নং ২৫১৫, হজ্জ অধ্যায়)। এই নির্দেশ সকল প্রকার সফরের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য, এমন কি হজ্জের সফরের জন্যেও প্রযোজ্য। কেননা কোন মাহরাম-পুরুষ মেয়েদের সাথে না থাকলে দুশ্চরিত্রের লোকদের মনে মেয়েদের প্রতি কুচিন্তা জাগ্রত হওয়াটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। আর এই সুযোগে ঐ চরিত্রহীন লোকেরা এধরনের একাকী সফরকারিণী মহিলার পিছু নিয়ে কোন ক্ষতি করতে পারে। আর নারীরা তো প্রকৃতিগত ভাবেই দুর্বল। তারা

তাদের মান, ইজ্জত ও আব্রু নিয়ে সামান্যতেই ভীত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় দুষ্ট লোকেরা তাদের পিছু নিলে বাধা দেয়া বা আত্মরক্ষামূলক কিছু করা তাদের পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

অনেক মহিলাকে বিমান কিংবা অন্য কোন যানবাহনে উঠার সময় তাদেরকে বিদায় জানাতে দু'একজন মাহরাম অর্থাৎ নিকট আত্মীয় সেখানে উপস্থিত থাকে। কিন্তু পুরো সফরে ঐ মহিলার পাশে কে থাকে? যদি বিমানে কোন ত্রুটি দেখা দেয়, আর তা অন্য কোন বিমান বন্দরে অবতরণ করতে বাধ্য হয়, কিংবা নির্দিষ্ট বিমান বন্দরে অবতরণ করতে বিলম্ব ঘটে– তাহলে তখন তার অবস্থা কী দাঁড়াবে? ট্রেন, বাস, স্টীমার বিভিন্ন সফরেও এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। তখন কী যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তা একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কাউকে বুঝিয়ে বলা কষ্টকর ব্যাপার। অতএব যে কোন অবস্থায় যে কোন ভ্রমণকারী মহিলার সাথে কমপক্ষে একজন মাহরাম পুরুষ থাকা একান্ত প্রয়োজন, যে তার পাশে বসবে এবং কোন বিপদে-আপদে বা যানবাহনে উঠা-নামার সময় তাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করবে।

জেনে রাখা প্রয়োজন যে, কোন পুরুষকে কোন স্ত্রীর মাহরাম হ'তে গেলে ৪টি শর্ত রয়েছে। যথাঃ ১. মুসলমান হওয়া, ২. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, ৩. সুস্থ বিবেক সম্পন্ন হওয়া, ৪. পুরুষ মানুষ হওয়া। যেমন এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"أَبُوْهَا أَوْ اِبْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوْهَا أَوْ ذُوْمَحْرَمٍ مِنْهَا" (مسلم ٩٧٧/٢).

অর্থঃ "মহিলার পিতা, তার পুত্র, তার স্বামী, তার ভাই অথবা তার কোন মাহরাম পুরুষ তার সঙ্গে থাকবে" (মুসলিম ২/৯৭৭)।

২৯. পরনারীর প্রতি ইচ্ছাপূর্বক দৃষ্টিপাত করা

(تَعَمُّدُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ)

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ﴾ (النور: ٣٠)

অর্থঃ "(হে মুহাম্মাদ! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আপনি মু'মিন বান্দাদেরকে বলেদিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নীচু করে রাখে আর তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। আর এ ব্যবস্থাতেই তাদের জন্য বড় পবিত্রতা রয়েছে। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ সব কিছুই খবর রাখেন" (আন-নূর,৩০)। এ প্রসঙ্গে মহানবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,"زِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ" অর্থঃ "চোখের যিনা হলো দৃষ্টিপাত করা বা দেখা" (বুখারী, ফাতহুলবারী ১১/২৬)। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে সব মেয়েলোকদেরকে দেখা হারাম করে দিয়েছেন তাদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে দেখাই হলো চোখের যিনা। তবে ইসলামী শরী'আত যে সমস্ত বিষয়ে বা যে সমস্ত প্রয়োজনে মেয়েদের প্রতি তাকানো এবং তাদেরকে দেখার অনুমতি দিয়েছে– সে সমস্ত বিষয়ে তাদেরকে দেখা যাবে, এতে কোন দোষ নেই। যেমন বিবাহের জন্য মেয়ে দেখা, ডাক্তার কর্তৃক রুগিণীকে দেখা ইত্যাদি।

এমনিভাবে পুরুষদের ন্যায় মহিলারাও অপরিচিত পুরুষদের প্রতি কুমতলবে তাকাতে পারবে না। কেননা এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ...﴾ (النـــور:٣١)

অর্থঃ "(হে নাবী! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আপনি ঈমানদার তথা বিশ্বাসী রমণীদেরকে বলেদিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নীচু রাখে আর তাদের লজ্জাস্থানকে হিফাযত করে" (আন-নূর,৩১)।

এমনিভাবে একজন পুরুষের সতর অন্য পুরুষের দেখা, আর একজন নারীর সতর অন্য একজন নারীর দেখাও হারাম। আর যে সতর দেখা জায়েয নেই সে সতর স্পর্শ করাও জায়েয নয়। এমনকি কোন আবরণ বা পর্দার উপর দিয়েও ঐ সতর বা লজ্জাস্থান স্পর্শ করা জায়েয নেই। এখন কথা হলো, বেশকিছু লোক তারা শয়তানি খেলায় মত্ত হয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, সিনেমা হলে বা ফিল্মে ও সিডিতে একেবারেই উলঙ্গ ছবি দেখে থাকে। তাদের দাবী হলো, এসব তো শুধু ছবি! এসমস্ত ছবির কোন বাস্তবতা নেই। সুতরাং এ গুলি দেখলে দোষ হবে কেন? তবে এগুলি যে পরিষ্কার হারাম এতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা এগুলির ক্ষতিকর এবং যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী প্রভাব খুবই স্পষ্ট। বলা যেতে পারে বর্তমান যুগে এই সমস্ত মাধ্যমগুলিই বিশেষ করে যুবক ছেলেদেরকে এবং যুবতী মেয়েদেরকে যিনা-ব্যভিচারের দিকে দুর্বার গতিতে ধাবিত করছে। মোটকথা বর্তমান এসব মাধ্যমগুলিকেই যিনা-ব্যভিচারের অন্যতম প্রবেশদ্বার হিসাবে গণ্য করা যায়। আর যিনা-ব্যভিচারের এসমস্ত মাধ্যমগুলি মুসলমানদের প্রকাশ্য শত্রু ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টানদের দ্বারা সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। এই ঘৃণিত পাপ কাজ থেকে আল্লাহ তা'আলা মুসলিম জাতিকে হিফাযত করুন। আমীন।

৩০. দাইয়ুছী বা নারী ও পুরুষদের বেপর্দায় থাকা?

(اَلدِّيَاثَةُ)

যে নারী বা পুরুষ পর্দা মানে না বা পর্দায় থাকে না আরবী ভাষায় তাকে 'দাইয়ূছ' বলা হয়। ইবনু-উমার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِيْ يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبِيْثَ" (أحمد٢/٦٩, صحيح الجامع ح/٣٠٤٧).

অর্থঃ "আল্লাহ তা'আলা ৩ ব্যক্তির জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন।

১. মদপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি

২. পিতা-মাতার অবাধ্য ছেলে

৩. 'দাইয়ূছ' অর্থাৎ যে নিজ পরিবারের মধ্যে বেপর্দা ও বেহায়াপনাকে জিইয়ে রাখে, এ ব্যাপারে কোন সতর্কতা অবলম্বন করে না" (আহমাদ ২/৬৯, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৩০৪৭)।

বর্তমান বিশ্বে পর্দাহীনতা বা কে কত বেশী খোলামেলা, বেহায়াপনা ও উলঙ্গপনা দেখাতে পারে তার নিত্যনতুন প্রতিযোগিতা চলছে ও তার জন্য কলা কৌশল বের করা হচ্ছে। বাড়ীতে মেয়ে কিংবা স্ত্রীকে একজন বেগানা পুরুষের পাশে বসে আলাপ-আলোচনা ও গল্প-গুজব করতে দেখেও বাড়ীর গার্জিয়ান পিতা বা স্বামী কিছুই বলেন না। বরং তিনি যেন এরূপ একাকী আলাপ-আলোচনায় খুশীই হন। মহিলাদের কোন বেগানা

পুরুষের সাথে একাকী বাইরে যাওয়াও দাইয়ূছী বা পর্দাহীনতার ভিতর গণ্য। ড্রাইভারের সাথে অনেক মহিলাকে এভাবে একাকী বাইরে যেতে দেখা যায়। এছাড়া যে সমস্ত অশ্লীল গান-বাজনা, উলঙ্গ ও নির্লজ্জ ছবি সম্বলিত ক্যাসেট, ফিল্ম, সিডি ও পত্র-পত্রিকা যা শান্তিপূর্ণ একটা সমাজ বা পরিবেশকে কলুষিত করে ও অশ্লীলতার বিস্তার ঘটায় সেগুলি আমদানী করা বা বাড়ীতে স্থান দেয়াও দাইয়ূছী কাজের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এসব হারাম কাজ থেকে আমাদেরকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে এ ব্যাপারে পূর্ণ তাওফীক্ব দান কর। আমীন।

(أَيَّتُهَا الْمُسْلِمَةُ ! حِجَابُكِ طَاعَةٌ لِرَبِّكِ وَاتِّبَاعٌ لِرَسُوْلِكِ)

হে মুসলিম নারী ! 'বোরকা পরিধান করা আপনার প্রতিপালক মহান আল্লাহ এবং আপনার রাসূলের নির্দেশ'। অতএব আপনি বোরকা পরিধান করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করুন'। ধন্যবাদ।

(أَيَّتُهَا الْمُسْلِمَةُ ! حِجَابُكِ يَحْفَظُكِ مِنْ عُيُوْنِ الأَعْدَاءِ، حِجَابُكِ فِيْ الدُّنْيَا سِتْرٌ وَ فِيْ الآخِرَةِ فَلَاحٌ)

ওহে মুসলিম রমণী ! 'আপনার বোরকা' দুষ্ট লোকের কুনজর হ'তে আপনাকে রক্ষা করবে। দুনিয়ার জীবনে 'বোরকা' আপনার শরীর ঢেকে রাখার ও আপনার মান-সম্মান রক্ষা করার অন্যতম মাধ্যম, আর পরকালীন জীবনে জাহান্নামের আগুন হ'তে আপনার মুক্তি লাভের অন্যতম অসীলা। অতএব এ বিষয়টি ভুলে যাবেন না।

(أُخْتِي الْعَزِيْزَةُ ! أَنْتِ وَحْدَكِ مُتَمَيِّزَةٌ عَنْ كُلِّ نِسَاءِ الْعَالَمِ بِحِجَابِكِ فَتَمَسَّكِيْ بِهِ لِتَكُوْنِيْ كَاللُّؤْلُؤَةِ فِيْ الْمَحَارِ)

ওহে মুসলিম ভগিণী ! 'বোরকা পরিধানের মাধ্যমে' বিশ্বের সমস্ত বোরকাবিহীন মহিলাদের

মধ্য হ'তে আপনি বিশেষভাবে সম্মানিতা হ'তে পারেন। অতএব 'বোরকা পরিধান করাকে' আপনি অভ্যাসে পরিণত করে নিন, তাহ'লে আপনি সমাজে, দেশে তদুপরি মহান আল্লাহর

নিকট ঝিনুকের পেটে সংরক্ষিত মহামূল্যবান মুক্তার মত সমাদৃত হ'তে সক্ষম হবেন– ইনশা'আল্লাহ।

৩১. পালক সন্তান গ্রহণ এবং নিজের ঔরসজাত সন্তানকে সন্তান হিসাবে অস্বীকার করা

(اَلتَّزْوِيْرُ فِيْ انْتِسَابِ الْوَلَدِ لِأَبِيْهِ وَجَحْدُ الرَّجُلِ وَلَدَهُ)

কোন মুসলমানের জন্য নিজের পিতা ব্যতীত অন্য কাউকে পিতা বলে পরিচয় দেওয়া ইসলামী শরী'আতে জায়েয নয়। এমনিভাবে এক গোত্রের লোক হয়ে নিজেকে অন্য গোত্রের লোক বলে পরিচয় দেওয়া বা দাবী করাও জায়েয নয়। দুনিয়াবী স্বার্থ হাছিল করার জন্য অনেকে এভাবে অপরকে নিজের পিতা হিসাবে পরিচয় দিয়ে থাকে। সরকারী পরিচয়ে তারা তাদের মিথ্যা পরিচয় তুলে ধরে। হয়ত বিভিন্ন কারণ বশতঃ শৈশবে অর্থাৎ শিশু অবস্থায় পিতা ছেলেকে ত্যাগ করেছে বা বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছে–এ কারণে ঐ ছেলে তার পিতার প্রতি

রাগান্বিত হয়ে যে তাকে লালন-পালন করেছিল তাকে পিতা বলে ডাকে। কিন্তু এসবই হারাম। এ কারণে নানাক্ষেত্রে বড় বিশৃংখলা দেখা দেয়। যেমন কোন পুরুষকে 'মাহরাম', 'মীরাছ' এবং বিয়ে-শাদী ইত্যাদির বিধানে সঠিকভাবে নির্ধারণ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। এ ধরনের কাজের ভয়াবহতা সম্পর্কে হযরত সা'আদ ও আবূ-বাকরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ" (بخارى, فتح البارى ٨/٤٥).

অর্থঃ "জেনে শুনে যে ব্যক্তি নিজ পিতাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে পিতা বলে পরিচয় দেয়, এ কারণে তার জন্য জান্নাত হারাম" (বুখারী, ফাতহুলবারী ৫/৪৫)।

যে সকল নিয়ম ও কাজ বংশ পরিচয়কে মিটিয়ে দেয় বা মিথ্যা সাব্যস্ত করে– ইসলামী শরী'আতে এগুলি সবই হারাম। অনেকেই আছে নিজ স্ত্রীর সাথে তুমুল ঝগড়া বাধিয়ে একেবারে দিশাহীন ও পাগলপারা হয়ে নিজ স্ত্রীর বিরুদ্ধে যিনা-ব্যভিচারের অপবাদ দিয়ে লোক সমাজে প্রচার করতে থাকে আর এদিকে নিজের ঔরসজাত সন্তানকে নিজের সন্তান বলে অস্বীকার করে; অথচ সে ভালকরেই জানে যে, ঐ সন্তানটি তারই ঔরসে জন্ম লাভ করেছে। আবার অনেক মহিলা আছে, যারা স্বামীর আমানতের খেয়ানত করে পরকিয়া প্রেমে পড়ে অন্য পুরুষের দ্বারা গর্ভবতী হয়– পরে সেই জারজ সন্তানকে নিজ স্বামীর বৈধ সন্তান হিসাবে স্বামীর বংশভুক্ত করে দেয়। এ সবই বড় ধরনের হারাম কাজ। ইসলামী শরী'আত এ বিষয়ে কঠোরভাবে তিরস্কার

করেছে। বিশেষকরে লি'আনের আয়াত নাযিল হওয়ার পরে এ বিষয়ে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِيْ شَيْئٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللهُ جَنَّتَهُ, وَ أَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ وَ فَضَحَهُ عَلَى رُؤُوْسِ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ"

(أبوداود ٢/٦٩٥, مشكوة ح/٣٣١٦).

অর্থঃ "যে মহিলা কোন সন্তানকে এমন কোন গোত্রভুক্ত করে দেয়, যে আসলে ঐ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়–তাহলে আল্লাহর নিকট ঐ মহিলার কোনই মূল্য নেই। আর আল্লাহ ঐ মহিলাকে কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। আর এমনিভাবে যে পুরুষলোক জেনে শুনে নিজ সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করবে, এ কারণে আল্লাহ ঐ পুরুষলোক থেকে পর্দা করে নিবেন, আর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল লোকদের সামনে তাকে অপদস্থ করবেন"(আবূদাউদ ২/৬৯৫, মিশকাত হাদীছ নং ৩৩১৬)।

৩২. সুদ খাওয়া (أَكْلُ الرِّبَا)

পবিত্র কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা একমাত্র সুদখোর ব্যতীত আর কারো বিরুদ্ধে স্বয়ং যুদ্ধের ঘোষণা দেননি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ - فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ﴾ (سورة البقرة: ٢٧٨-٢٧٩)

অর্থঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর সুদের যা কিছু অবশিষ্ট আছে, তা সব পরিত্যাগ কর যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। আর যদি তোমরা তা না কর, তাহ'লে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শোন" (আল-বাক্বারাহ,২৭৮-২৭৯)।

মহান আল্লাহর নিকট সূদ খাওয়া যে কত বড় মারাত্মক অন্যায় তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করার জন্য উল্লিখিত আয়াত দু'টিই যথেষ্ট। এই সূদ ব্যবস্থার কারণে সমাজে দরিদ্রতা,ঋণ পরিশোধে অক্ষমতা, অর্থনৈতিক স্থবিরতা বা অর্থনৈতিক সমস্যা, বেকারত্ব, বহু কোম্পানী ও প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়াত্ব ইত্যাদির ন্যায় কত যে জঘন্য ক্ষতি ও ধ্বংসের দিকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ঠেলে দিচ্ছে তা একমাত্র এবিষয়ে গবেষণাকারীরাই যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম। একজন দিনমজুরী খাটা মানুষ সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে শরীরের ঘাম ঝরিয়ে যা উপার্জন করে, তা ব্যাংকে বা বিভিন্ন খাতে সূদ পরিশোধ করতে করতে তার সবই শেষ হয়ে যায়। সূদের ফলে সমাজে একটা বিশেষ ধনী শ্রেণীর মানুষের উদ্ভব ঘটে। কিছু সংখ্যক মানুষের হাতে অধিকাংশ অর্থ সম্পদ পুঞ্জীভুত বা জমা হয়ে পড়ে। অপরদিকে সমাজের বা দেশের গরীব দুঃখীরা ক্রমেই বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হ'তে থাকে। সম্ভবত এ সমস্ত কারণেই আল্লাহ তা'আলা সুদীকারবারীদের বিরুদ্ধে নিজেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। সুদী কারবারে মূল দু'পক্ষ, মধ্যস্থতাকারী, সহযোগিতাকারী ইত্যাদি যারাই এর সাথে জড়িত থাকবে, তাদের সকলকেই মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) অভিশাপ বা বদদু'আ করেছেন।

জাবের (রাঃ) বলেন,

"لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ" (مسلم ١٢١٩/٣).

অর্থঃ "রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুদের লেখক আর সুদের দু'জন সাক্ষীকে অভিশাপ বা বদদু'আ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, তারা সকলেই সমান অপরাধী" (মুসলিম ৩/১২১৯)। আর এ কারণেই সুদের হিসাব-নিকাশ লেখা, সুদ কাউকে দেওয়া বা নেওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করা, সুদী দ্রব্য গচ্ছিত বা আমানত রাখা আর সুদী মাল-পত্রের পাহারা দেওয়া সবই নাজায়েয। মোটকথা, সুদের কাজে অংশগ্রহণ করা আর যে কোন ভাবে সুদের সাহায্য-সহযোগিতা করা সবই হারাম।

সুদের কঠিন ভয়াবহতা সম্পর্কে আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"لِلرِّبَا ثَلاَثَةٌ وَّسَبْعُوْنَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَّنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ" (مستدرك حاكم ٣٧/٢, صحيح الجامع /٣٥٣٣).

অর্থঃ "সুদের ৭৩টি দরজা বা স্তর রয়েছে। তার মধ্যে সবচাইতে সহজ স্তরটি হলো, আপন মায়ের সাথে যিনা করার সমতুল্য। আর সবচেয়ে কঠিন স্তরটি হলো, কোন মুসলিম ব্যক্তিকে অপমান-অপদস্থ করা" (মুস্তাদরাক হাকিম ২/৩৭, ছহীহুল জামে হাদীছ ৩৫৩৩)। আব্দুল্লাহ বিন হানজালা বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আরো বলেছেন,

"دِرْهَمُ رِبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَّثَلَاثِيْنَ زَنْيَةً" (أحمد ٥/٢٢٥، صحيح الجامع ح/٣٣٧٥).

অর্থঃ "কোন লোক যদি ভালভাবে জেনে বুঝে সুদের ১টাকা খায়, তাহলে এটাই ৩৬বার যিনা করার চেয়েও কঠিন পাপের কাজ হিসাবে গণ্য হবে" (আহমাদ ৫/২২৫, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৩৩৭৫)।

সুদ ধনী-গরীব নির্বিশেষে সবার জন্য হারাম। সকলকেই তা পরিহার করতে হবে। সুদ এতবড় জঘন্য ও ঘৃণিত পাপের কাজ হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান সমাজের ও দেশের বহু ধনী লোক আর বহু ব্যবসায়ী লোক এই সুদের সাথে জড়িয়ে গেছে, সুদের ভিতরে তারা হাবুডুবু খাচ্ছে। আর এই সুদের সবচেয়ে ছোট ক্ষতি হলো, মালের বরকত উঠে যায়, বাহ্যিকভাবে সুদের মাল যতই বেশী দেখা যাক না কেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"اَلرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيْرُ إِلَى قُلٍّ" (حاكم ٢/٣٧، صحيح الجامع ح/٣٥٤٢).

অর্থঃ "বাহ্যিকভাবে সুদ পরিমাণে যতই বেশী দেখা যাক না কেন, প্রকৃতপক্ষে পরিণামে বা ফলাফলের দিকদিয়ে ঐ সুদের মাল কম হয়ে যায়" (হাকেম ২/৩৭, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৩৫৪২)। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, শয়তান যেমন করে দুনিয়াতে কাউকে প্ররোচনা দিয়ে বা স্পর্শ করে পরিশেষে তাকে পাগল বানিয়ে দেয়, ঠিক তেমনিভাবে সুদখোর ব্যক্তি পাগল হয়ে ক্বিয়ামতের দিন উঠবে।

এখন কথা হলো, নিঃসন্দেহে সুদের কারবার বা সুদের লেনদেন খুব বড় ধরনের পাপের কাজ। তবুও মহান রাব্বুল

আলামীন মানুষের প্রতি দয়াশীল হয়ে মানুষকে ঐ ঘৃণিত পাপকাজ থেকে তাওবা করার পদ্ধতি বলে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ﴾ (البقرة:٢٧٩)

অর্থঃ "যদি তোমরা (সুদের কার্যক্রম ছেড়ে দিয়ে) তওবা কর, তাহ'লে তোমরা (সুদে লাগানো টাকা-পয়সা বা সম্পদ হতে) তোমাদের শুধু মূলধন ফেরৎ পাবে। তাহলে তোমরা (এই পদ্ধতি মুতাবিক) না কারোর প্রতি অত্যাচার করবে, আর না তোমরাও অত্যাচারিত হবে" (আল-বাক্বারাহ,২৭৯)।

সত্যিকার অর্থে প্রত্যেক মু'মিন বান্দার অন্তরে সুদের প্রতি ঘৃণা এবং তার খারাপ দিকগুলি সম্পর্কে তীব্র অনুভূতি থাকা একান্ত প্রয়োজন। এমনকি যারা টাকা-পয়সা ও মূল্যবান সম্পদ চুরি হয়ে যাওয়া কিংবা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভয়ে সুদী ব্যাংকে টাকা-পয়সা সব জমা রাখে, তাদের মধ্যেও একান্ত বিপদ গ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় অনুভূতি থাকতে হবে, যেন তারা বাধ্যহয়ে মৃত জানোয়ারের গোশত খাওয়া কিংবা তার থেকেও কঠিন পরিস্থিতির স্বীকার হয়েছে। তাই তারা সব সময় মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আর সুদী ব্যাংকের পরিবর্তে সুদ বিহীন কোন ভাল উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। তাদের আমানতের পরিবর্তে সুদী ব্যাংকের নিকট কোন সুদ দাবী করা জায়েয হবে না, তবে যদি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাদের মূলধনের হিসাব করে সুদের টাকা তাদের হাতে উঠিয়ে দেয়–তাহ'লে জায়েয উপায়ে তার থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবে, তবে ঐ সুদের টাকা কাউকে দান করবে না। কেননা মহান আল্লাহ

রাব্বুল আলামীন পবিত্র, আর একমাত্র পবিত্র জিনিস ছাড়া তিনি অন্য কোন জিনিস দান করার অনুমতি দেননা। এছাড়া নিজের কোন কাজে সুদের টাকা ব্যয় করা যাবে না। না খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে, কাপড়-চোপড় পরিধানের ব্যাপারে, ঘর-বাড়ী তৈরীর ব্যাপারে, ছেলে- মেয়ে, পিতা-মাতা, স্ত্রী পরিবার-পরিজনদের ভরণ-পোষণের ব্যাপারে, যাকাত আদায় ও কোন ট্যাক্স পরিশোধ করার ব্যাপারে ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোন রকমেই সুদের টাকা লাগানো যাবেনা। ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ঐ সুদের টাকা শুধুমাত্র আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এমনিতেই কাউকে দিয়ে দিতে হবে।

৩৩. বিক্রয়ের সময় যে কোন বস্তুর দোষ গোপন করা

(كَتْمُ عُيُوْبِ السِّلْعَةِ وَ إِخْفَاؤُهَا عِنْدَ بَيْعِهَا)

একদিন রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) মদীনার বাজারের মধ্য দিয়ে এক খাদ্য স্তুপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি খাদ্য স্তুপের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে তাঁর আঙ্গুলে আদ্রতা অনুভব করলেন। তখন তিনি বিক্রেতাকে বললেন, "হে খাদ্য বিক্রেতা! ব্যাপার কী? সে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম) এতে বৃষ্টির পানি লেগেছে'। তখন রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বললেন, তুমি ওটাকে ঐ স্তুপের উপরে রাখ নি কেন? তাহ'লে মানুষেরা বৃষ্টির পানিতে ভিজে যাওয়া খাদ্যবস্তুগুলো সহজেই দেখতে পেত। মনে রেখো! "যে মানুষকে ধোঁকা দেয় বা মানুষের সাথে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়" (মুসলিম, ১/৯৯)।

আজকাল আল্লাহর ভয়ভীতি শূন্য অধিকাংশ বিক্রেতাই ভাল পণ্যের সঙ্গে অর্থাৎ ভাল জিনিস-পত্রের সাথে ক্রটিযুক্ত কিংবা নিম্নমানের পণ্য মিশিয়ে বিক্রয় করে থাকে। আর কেউ কেউ ক্রটিযুক্ত পণ্যগুলিকে গাইট বা কন্টেনারের নীচে রাখে। আবার অনেকে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যাবহার করে নিম্নমানের দ্রব্যকে আপাত-দৃষ্টিতে উন্নতমানের করে তোলে। কেউ কেউ আবার পণ্য ব্যবহারের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর তা পরিবর্তন করে নতুন মেয়াদকালের ছাপ মেরে দেয়। আর কোন কোন বিক্রেতা ক্রেতাকে বিক্রয়ের সময় জিনিস-পত্রগুলি ভালকরে দেখে-শুনে ও যাচাই-বাছাই করে ক্রয় করার সুযোগ দেয় না। উল্লিখিত পদ্ধতির সকল বেচা-কেনাই হারাম। কেননা এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيْهِ بَيْعًا فِيْهِ عَيْبٌ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ" (ابن ماجه ٢/٧٥٤, صحيح الجامع ٦٧٠٥).

অর্থঃ "একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। কাজেই কোন মুসলমানের পক্ষে তার অন্য ভাইয়ের নিকট ক্রটিপূর্ণ কোন জিনিস বিক্রয় করা মোটেই জায়েয নয়। তবে হাঁ যদি বিক্রেতা জিনিসের ক্রটি সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে বলে দেয়, তাহ'লে জায়েয হবে।

অতএব কোন বিক্রেতা যদি বেচা-কেনার ক্ষেত্রে ক্রেতার সাথে কোন প্রকার ধোঁকাবাজী করে বা জিনিসের দোষ-ক্রটি লুকিয়ে রাখে– তাহলে পরবর্তীতে ক্রেতার নিকট ঐ সমস্ত ক্রয়কৃত জিনিসের ভিতর কোন ক্রটি প্রকাশ পেলে ইসলামী

শরী'আত মুতাবিক ক্রেতা ইচ্ছা করলে ঐ ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করে দিয়ে ক্রয়কৃত বস্তু বিক্রেতাকে ফেরৎ দিয়ে তার পূর্ণ অর্থ ফেরৎ নিতে পারবে। আর এধরনের ধোঁকাবাজীর ব্যবসা-বাণিজ্যে আল্লাহর তরফ থেকে কোন বরকত থাকে না। এপ্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا" (بخارى, فتح البارى ٤/٣٢٨).

অর্থঃ "ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতার দৈহিকভাবে পৃথক হওয়া কিংবা বিক্রয় প্রস্তাব ও ক্রয়কৃত বস্তু গ্রহণে বিক্রেতা ও ক্রেতার মাঝে কোনরূপ মতবিরোধ না হওয়া পর্যন্ত ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য বিক্রয় কার্যকর করার অথবা বিক্রয় বাতিল করার অধিকার থাকবে। আর বিক্রেতা ও ক্রেতা তাদের বেচা-কেনার ভিতর উভয়েই যদি সত্য কথা বলে, আর উভয়েই যদি জিনিসের দোষ-গুণ একে অপরকে পরিষ্কারভাবে বলে দেয়, তাহ'লে তাদের ঐ বেচা-কেনায় আল্লাহর তরফ থেকে বরকত হয়। আর দু'জনেই যদি বেচা-কেনার ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নেয় অর্থাৎ মিথ্যা কথাবার্তা ও ধোঁকাবাজী করে আর বিক্রেতা যদি জিনিস পত্রের দোষ গোপন করে বিক্রয় করে তাহ'লে তাদের কেনা-বেচার ভিতর থেকে বরকত উঠে যায়" (বুখারী, ফাতহুলবারী ৪/৩২৮)। যেমন বিক্রেতা হয়ত ওজনে কম দিল কিংবা ভাল জিনিসের সাথে খারাপ জিনিস মিশ্রিত করে দিল, যেমন কেউ ভাল সরিষার তৈলের সাথে খারাপ সরিষার তৈল মিশ্রিত করে দিল, বা কেউ হয়ত ৪কেজি নারিকেল তৈলের সাথে ১কেজি সয়াবিন তৈল মিশ্রিত করে বিক্রয় করল ইত্যাদি। এমনিভাবে ক্রেতা হয়ত

বিক্রেতার নিকট থেকে মালপত্র ওজন করে নেওয়ার সময় চুরিকরে ওজনে বেশী করে নিল, যেমন আমাদের সমাজে ও দেশে বিশেষ করে ধান ও পাট বিক্রয়ের সময় ক্রেতারা কাঁটার দাঁড়িতে বা হন্দরে অনেক হেরফের করে মাপে বেশী নেয়, আবার অনেক সময় ক্রেতারা মালপত্র তাড়াতাড়ি বিক্রেতার নিকট থেকে নিয়ে জাল নোট দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ভেগে যায় ইত্যাদি।

৩৪. দালালী করা (بَيْعُ النَّجَشِ)

বিশ্বের প্রায় সব দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বা বেচা-কেনার ক্ষেত্রে দালালী প্রথা বা দালালী ব্যবসার প্রচলন আছে। স্থান-কাল ও পাত্র ভেদে এই দালালী ব্যবসার রূপ বা ধরণ বহু প্রকার। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এই দালালী ব্যবসার দু'একটি ধরন নিম্নে আলোচনা করা হলো। এমন অনেক লোক আছে যাদের জিনিস-পত্র কেনা উদ্দেশ্য নয়। অন্য লোকে যাতে ঐ জিনিস-পত্র বেশী দামে কিনতে উদ্বুদ্ধ হয় সে জন্য পণ্যের অর্থাৎ মাল-পত্রের পাশে ঘুরাঘুরি করে আর জিনিসের দাম বাড়িয়ে বলতে থাকে। আর এটাই ধোঁকাবাজী ও প্রতারণামূলক দালালী। এতে আসল ক্রেতাগণ ভাবে যে, পণ্যটির দাম আসলেই বেশী। অতএব আরো কিছু বেশী দাম না দিলে এই লোকটিই তা খরিদ করে নিয়ে যাবে। এভাবে দালালের খপ্পরে পড়ে সে অল্প দামের জিনিস বেশী দামে আর নিম্ন মানের জিনিসকে উন্নত মানের জিনিস ভেবে তাড়াতাড়ি খরিদ করে

ফেলে। পরে বুঝতে পারে যে, সে দালালের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন, لاَتَنَاجَشُوْا অর্থঃ "ক্রেতার ভান করে তোমরা পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিও না" (বুখারী, ফাতহুলবারী ১০/৪৮৪)। এটা নিঃসন্দেহে এক শ্রেণীর প্রতারণা। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আরো বলেছেন,

" اَلْمَكْرُ وَالْخَدِيْعَةُ فِي النَّارِ"(سلسلة الأحاديث الصحيحة ح/١٠٥٤).

অর্থঃ "যে কোন বিষয়ে যে চালবাজী ও ধোঁকাবাজী করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে"(সিলসিলাতুল আহাদীছিছ ছহীহাহ হাদীছ নং ১054)। বিশেষকরে পশু বিক্রয়, নিলামে বিক্রয় ও গাড়ী প্রদর্শনীতে অনেক দালালকে দেখতে পাওয়া যায় যে, যাদের আয় রোযগার সবই হারাম আর হারাম। কেননা এই উপার্জনের সাথে অনেক অবৈধ মাধ্যম জড়িত আছে। যেমন, প্রতারণামূলক দাম বৃদ্ধি বা মিথ্যা দালালী, ক্রেতাকে ধোঁকায় ফেলা, বাজারে পণ্য নিয়ে আসছে এমন এমন বিক্রেতাকে ধোঁকায় ফেলে পথিমধ্যেই তার পণ্য অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে খরিদ করা ইত্যাদি। আর অনেক সময় বিক্রেতারা একে অপরের জন্য দালাল সাজে কিংবা দালাল নিয়োগ করে। তারা ক্রেতার বেশ ধারণ করে খরিদ্দারের মধ্যে ঢুকে পড়ে আর পণ্যের দাম ক্রমে ক্রমে বাড়িয়ে দেয়। এভাবে তারা আল্লাহর বান্দাদেরকে ধোঁকা দেয় ও তাদেরকে বিপদে ফেলে। যেসব দেশে নিলাম বিক্রয়ের প্রচলন রয়েছে, সেখানেই এরূপ দালালী ব্যবসার প্রবণতা সবচেয়ে বেশী দেখতে পাওয়া যায়।

৩৫. জুম'আর দিন জুম'আর খুৎবার আযানের পর বেচা-কেনা করা

(اَلْبَيْعُ بَعْدَ النِّدَاءِ الثَّانِيْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)

জুম'আর খুৎবার আযানের পর বেচা-কেনা করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾ (الجمعة:٩)

অর্থঃ "হে ঈমানদারগণ! জুম'আর দিন যখন জুম'আর নামাযের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের জন্য দ্রুত গতিতে (মাসজিদের দিকে) অগ্রসর হও, আর বেচা-কেনা ছেড়ে দাও। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা অবগত হও" (আল-জুম'আ, ৯)। উল্লিখিত আয়াতের আলোকে উলামায়ে কেরাম আযান হ'তে ফরয নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত বেচা-কেনা ও অন্যান্য সকল কাজকর্ম হারাম বলে উল্লেখ করেছেন। বর্তমান অনেক দোকানদারকে দেখা যায় তারা আযানের সময়ও নিজেদের দোকানে কিংবা মাসজিদের সামনে কেনা-বেচা চালিয়ে যাচ্ছে। আর যারা এ সময় কেনা-কাটায় অংশ নেয়, তারাও কিন্তু তাদের সাথে পাপের অংশীদার হবে। এমন কি সামান্য একটি মিসওয়াক বেচা-কেনা করলেও ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই এ ব্যাপারে গোনাহগার হবে। উলামাদের জোরালো মতানুসারে জুম'আর দিন খুৎবার আযানের পরে সকল প্রকার বেচা-কেনা বাতিল বলে গণ্য হবে।

এছাড়া অনেক হোটেল, বেকারী, ফ্যাক্টরী, কলকারখানা ইত্যাদির লোকেরা জুম'আর নামাযের সময় তাদের শ্রমিকদেরকে কাজ চালিয়ে যেতে বাধ্য করে। তাতে বাহ্যিকভাবে কিছু লাভ দেখা গেলেও প্রকৃত পক্ষে তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়। কারণ আল্লাহর নাফরমানী করে কোন কাজে প্রকৃত পক্ষে লাভবান হওয়া যায় না। এ মর্মে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"لاَ طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ" (بخاري, مسلم, أحمد ١/١٢٩).

অর্থঃ "মহান আল্লাহর আদেশ অমান্য করে কোন প্রকারেই কোন মানুষের আনুগত্য করা যাবে না" (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ ১/১২৯)।

৩৬. জুয়া খেলা (اَلْقِمَارُ وَالْمَيْسِرُ)

জুয়া, মদ ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾ (المائدة: ٩٠)

অর্থঃ "হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, বেদী বা মূর্তি এবং ভাগ্য নির্ধারণকারী তীর এ সবই অবিত্র ও শয়তানী কাজ। অতএব শয়তানের এ সমস্ত কাজ থেকে তোমরা বিরত থাক। তাহ'লে তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে।" (আল-মায়েদা, ৯০)

জাহেলী যুগের লোকেরা জুয়া খেলায় খুবই অভ্যস্ত ও পারদর্শী ছিল। জুয়ার যে পদ্ধতি তাদের মধ্যে খুব প্রসিদ্ধ ছিল তা হলোঃ তারা ১০জনে সমান অংকের মুদ্রা বা অর্থ দিয়ে প্রথমে একটা উট ক্রয় করে নিত। পরে সেই উটের গোশত নিজেদের

মাঝে ভাগ-বন্টন করে নেওয়ার জন্য জুয়ার তীর ব্যাবহার করত। এটা এক প্রকার লটারী। ১০টি তীরের মধ্য হতে ৭টি তীরে কম-বেশী করে বিভিন্ন অংশ লেখা থাকত আর ৩টি তীরে কোন কিছুই লেখা থাকত না। ফলে ৩জন কোনই অংশ পেত না, আর বাকী ৭জন তাদের প্রচলিত নিয়মে কম-বেশী সকলেই অংশ পেত। এভাবে তাদের ১০জনের টাকায় কেনা উট ৭জনে ভাগ করে নিত।

বর্তমান বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে জুয়ার বিভিন্ন রকম পদ্ধতি বের হয়েছে। তার মধ্য হ'তে কয়েকটি পদ্ধতি নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

লটারীঃ লটারী খুবই প্রসিদ্ধ জুয়া। লটারী বিভিন্ন ধরনের আছে। তার মধ্য হ'তে সবচেয়ে বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হলো, নির্দিষ্ট অংকের টাকা কিংবা কোন বস্তু পুরস্কার হিসাবে দেওয়ার বিনিময়ে নির্ধারিত নম্বরের কুপন ক্রয়-বিক্রয় করা। নির্ধারিত তারিখে বিক্রিত কুপনগুলির ড্র অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম যে নম্বরের কুপনটি ওঠে সে প্রথম পুরস্কার পেয়ে থাকে। এভাবে পর্যায়ক্রমে নির্ধারিত সংখ্যক পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। পুরস্কারের অংকগুলিতে প্রায়ই অনেক তারতম্য থাকে। এভাবে লটারী করা হারাম, যদিও এই লটারীর আয়োজনকারীরা এটাকে ভাল মনে করে।

বীমাঃ বর্তমান বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে বিভিন্ন পদ্ধতির বীমা চালু হয়েছে। যেমন জীবন বীমা, যানবাহন বীমা, কোন বস্তুর বীমা, অগ্নি বীমা ইত্যাদি। এমনকি অনেক গায়ক-গায়িকা তাদের কণ্ঠস্বর পর্যন্ত বীমা করে থাকে। বাহ্যিকভাবে বিভিন্ন ধরনের বিপদ হ'তে নিরাপত্তা লাভের জন্য এ বীমা ব্যবসা বর্তমান খুবই জমজমাটভাবে চলছে।

বিক্রিত জিনিসের মধ্যে অজ্ঞাত সংকেত দেওয়াঃ

কোন কোন পণ্য সামগ্রীর মধ্যে অজ্ঞাত অর্থাৎ অজানা নম্বর কিংবা সংকেত দেওয়া থাকে। ক্রেতারা ঐ পণ্য খরিদ করার পর সেই বস্তু কিংবা নম্বরটা পেলে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত কয়েকজনকে পুরস্কার দেওয়ার জন্য ঐ সব বস্তুর বা নম্বরের লটারী করে থাকে। অনেক সময় কোন কোন উৎপাদনকারী কোম্পানী তাদের উৎপাদিত পণ্যের বহুল বিক্রয়ের জন্য হাজার হাজার পণ্যের মধ্য হ'তে কোন একটিতে পুরস্কারের সংকেত রেখে দেয়। সেই সংকেতটি পাওয়ার আশায় বহু মানুষ তা কেনার জন্য মেতে উঠে। পরে দেখা যায় দু'একজনের বেশী কেউ পায় না। এরূপ বিক্রয়ে ক্রেতারা প্রতারিত হয়, আর সেই সাথে প্রতিযোগী কোম্পানীদের ব্যবসায়ে ক্ষতি করা হয়।

উল্লিখিত জুয়া ছাড়াও আরো যত প্রকার জুয়া আছে সবই কুরআনে বর্ণিত 'মায়সির' এর অন্তর্ভুক্ত হবে। বর্তমানে জুয়ার জন্য বিশেষ আসর বসে, যা কোথাও 'হাউজি' আর কোথাও 'সবুজ টেবিল' নামে পরিচিত। ফুটবল ও অন্যান্য খেলাধুলার প্রতিযোগিতায় যে বাজী ধরা হয় তাও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। আবার খেলাধুলার এমন অনেক পাড়া ও কেন্দ্র আছে যেখানে জুয়ার চিন্তাধারায় গড়ে উঠা বিভিন্ন রকম খেলার প্রচলন রয়েছে। যেমন ফিলাস, পাশা ইত্যাদি।

তবে মানুষ যে সব প্রতিযোগিতা করে তা সাধারণভাবে ৩ প্রকার। যথাঃ

১. শার'ঈ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য প্রসূত প্রতিযোগিতা। যেমন উট ও ঘোড়া দৌড়ের প্রতিযোগিতা, তীরন্দাজী ও নিশানার প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। শা'রঈ বিদ্যা যেমন কুরআন হিফয প্রতিযোগিতাও আলিমদের প্রাধান্য দেওয়া মতানুসারে এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এ জাতীয় প্রতিযোগিতা পুরস্কারসহ বা পুরস্কার ছাড়া যেভাবেই হউক মুবাহ বা জায়েয হবে।

২. মূলে মুবাহ অর্থাৎ আসলেই জায়েয এমন সব প্রতিযোগিতা। যেমন ফুটবল প্রতিযোগিতা, দৌড় প্রতিযোগিতা। তবে এসব খেলাগুলি শর্ত সাপেক্ষে অর্থাৎ হারাম কার্যক্রম থেকে মুক্ত হ'তে হবে। যেমন-এসব খেলা করতে কিংবা দেখতে গিয়ে নামায নষ্ট করা কিংবা ছতর খোলা হারাম। পুরস্কার ছাড়া এ সব প্রতিযোগিতা জায়েয।

৩. মূলে হারাম কিংবা মাধ্যম হারাম এমন সব প্রতিযোগিতা। যেমন বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতার নামে উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনার প্রতিযোগিতা, মুষ্টিযুদ্ধের প্রতিযোগিতা। মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় একে অপরের মুখে আঘাত করা হয়, অথচ মুখমন্ডলে আঘাত করা ইসলামী শরী'য়াতে পরিষ্কার হারাম। অতএব মুষ্টিযুদ্ধ হারামের মাধ্যমে একটি প্রতিযোগিতা। অনুরূপভাবে মহিষের লড়াই, মোরগের লড়াই, ষাঁড়ের লড়াই ইত্যাদিও এর শ্রেণীভুক্ত। এ জাতীয় যে কোন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা হারাম। অতএব এ জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী, প্রতিযোগিতার আয়োজনকারী, দর্শক সবাই হারামের অপরাধে অভিযুক্ত হবে। শুধু তাই নয় এ ধরনের প্রতিযোগিতার সমস্ত আয়-ব্যয়ের সবই হারাম হিসাবে গণ্য হবে।

৩৭. চুরি করা (اَلسَّرِقَةُ)

'চুরি করা' প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾ (المائدة:٣٨)

অর্থঃ "পুরুষ চোর আর নারী চোর তাদের যে কেউ চুরি করলে তোমরা তাদের উভয়ের হাত কেটে দিবে। এটা তাদের কৃত কর্মের ফল আর আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত আদর্শদণ্ড। আর মহান আল্লাহ তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" (আল-মায়েদা, ৩৮)

চুরির মধ্যে সবচেয়ে বড় চুরি হলো, হজ্জ ও ওমরার উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ শরীফে আগমনকারীদের জিনিস-পত্র চুরি করা। অর্থাৎ হাজী সাহেবদের মাল-পত্র চুরি করা ও লুট-পাট করে নেওয়া। পৃথিবীর সর্বোত্তম স্থানে চুরি করা অর্থাৎ মক্কা শরীফে ও মদীনা শরীফে চুরি করা আল্লাহর নাফরমানীর মধ্য হ'তে সবচেয়ে বড় নাফরমানীর ভিতরে গণ্য। এতে যেন আল্লাহর বিধানকে একেবারেই অগ্রাহ্য করা হয়। আর এ জন্যেই মহা নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) 'ছালাতুল কুসূফ' এর ঘটনায় বলেছিলেন,

"لَقَدْ جِيْءَ بِالنَّارِ وَذَلِكُمْ حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِيْ تَأَخَّرْتُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيْبَنِيْ مِنْ لَفْحِهَا وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيْهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ-كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِيْ وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ" (مسلم ح/٩٠٤).

অর্থঃ " (আমার সামনে) জাহান্নামকে হাযির করা হয়েছিল। এটা সেই সময় হয়েছিল যখন তোমরা আমাকে পিছু হটতে

দেখেছিলে, আমি তার লেলিহান শিখায় আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে পিছিয়ে আসছিলাম। এমন সময় আমি তার মধ্যে একজন বাঁকা মাথা বিশিষ্ট লাঠি ওয়ালাকে দেখতে পেলাম, আগুনের মধ্যে যার পেট ধরে টানা হচ্ছে। কেননা সে হাজীদের বাঁকা মাথা বিশিষ্ট লাঠি চুরি করত। আর ধরা পড়লে সে বলত, আমার লাঠির সাথে মিশে গিয়েছিল বলে এমন হয়েছে। আর সে ধরা না পড়লে লাঠি নিয়ে কেটে পড়ত" (মুসলিম হাদীছ নং ৯০৪)।

এখন কথা হলোঃ সরকারী সম্পদ চুরি করাও বড় আকারের চুরির অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান সমাজে বহুলোক এভাবে চুরি করতে খুবই পারদর্শী। তারা বলে থাকে যে, 'অন্যরা বা বড় বড় মন্ত্রী-মিনিষ্টাররা চুরি করে তাই আমরাও চুরি করি'। অথচ তারা ভাল করেই জানে যে, এই চুরির মাধ্যমে দেশের সকল মুসলমান বা দেশের সকল জনগণের সম্পদ চুরি করা হচ্ছে। আর যারা আল্লাহকে ভয় করে না বা আল্লাহর নাফরমান বান্দাদের কোন হারাম কাজ কোন মুসলমান ব্যক্তির জন্য কোন প্রকারেই দলীল হ'তে পারে না। আর ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের কোন কাজেরও অনুকরণ করা কোন মু'মিন বান্দার পক্ষে ঠিক হবে না। এমনকি এই ধরনের সরকারী সম্পদ বা জনগণের সম্পদ যে আত্মসাৎ করে, যে চুরি করে– তাদের সাথে আত্মীয়তা করা, তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা এবং তাদের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করা ইত্যাদি সত্যিকার কোন পরহেযগার মুসলমানের জন্য জায়েয হতে পারে না।

এমন কেউ কেউ আছে, যারা কাফিরদের সম্পদ এ যুক্তিতে চুরি করে থাকে যে, লোকটা কাফির, তার সম্পদ মুসলমানের জন্য গ্রহণ করা মুবাহ বা হালাল। তাদের এ সমস্ত ধারণা সবই ভুল। কেননা যে সকল কাফির মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত

হয়, কেবল তাদের সম্পদ মুসলমানদের জন্য বৈধ বা জায়েয। অতএব কাফিরদের সকল ব্যক্তি ও তাদের অর্থকড়ি ও সম্পদ বা প্রতিষ্ঠান উল্লিখিত বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়।

বর্তমান বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ দেশের শহরে-বন্দরে, হাটে-বাজারে, বাসে, ট্রেনে যে চুরির কাজটি সবচেয়ে বেশী ঘটছে– সেটা হলোঃ পকেট মারা অর্থাৎ অন্য লোকের পকেট থেকে টাকা-পয়সা চুরি করে নেওয়া। এছাড়া অনেকেই কারো সাথে দেখা করতে তার বাড়ীতে যায় আর চুরি করে নিয়ে আসে। অনেকে আবার নিজেদের বাড়ীতে বেড়াতে আসা মেহমানদের ব্যাগ হ'তে টাকা-পয়সা নিয়ে নেয়। আবার অনেক চোর বাজারে বা বড় দোকানে প্রবেশ করে কিছু না কিছু জিনিস-পত্র চুরি করে নিজের পকেটে বা থলিতে ভরে নিয়ে চলে আসে। আর অনেক মহিলা আছে যারা এমনিভাবে বাজারে বা দুকানে যেয়ে কিছু জিনিস-পত্র চুরি করে নিজেদের পরিধেয় কাপড়ের ভিতরে লুকিয়ে নিয়ে আসে। আবার কেউ কেউ সামান্য কোন জিনিস কিংবা সস্তা কোন জিনিস চুরি করাকে তেমন অপরাধ বলে মনে করেন না। অথচ এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَ يَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ" (بخارى ,فتح البارى ١٠٣/٥).

অর্থঃ "সেই চোরের উপর আল্লাহ লা'আনত বা অভিশাপ দিয়েছেন, যে একটি ডিম চুরি করার ফলে তার হাত কাটা হয়। এমনিভাবে যে একগাছি রশি চুরি করার ফলে তার হাত কাটা যায়" (বুখারী, ফাতহুল বারী ১২/৮১পৃঃ)।

এখন কথা হলো– চোর পুরুষ হোক আর নারী হোক, চুরিকৃত মালের পরিমাণ কম হোক আর বেশী হোক, চোর যদি খালেছ ভাবে তওবা করতে চায় তাহ'লে তার কী করণীয় ? **উত্তরঃ** কোন চোর খালেছভাবে আল্লাহর নিকট তাওবা করতে চাইলে তার করণীয় হবে–

১. সকল প্রকার চুরিকাজ থেকে পূর্ণভাবে ফিরে আসতে হবে।

২. চুরি কাজের এই ঘৃণিত অপরাধের জন্য নিজের মনে মনে অনুশোচনা করে ও অনুতপ্ত হয়ে মহান

আল্লাহর কাছে অনুনয়-বিনয় করে মাফ চাইতে হবে।

৩. ভবিষ্যতে যেন এই চুরির কাজ দ্বিতীয়বার তার দ্বারা সংঘটিত না হয়।

৪. আল্লাহর নিকট তাওবা করার সাথে সাথে তার নিকট যদি ঐ চুরি করা মাল-পত্র অবশিষ্ট থাকে তাহলে তা মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব- তা প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, সরাসরি হোক অথবা কারো মাধ্যমে হোক। কিন্তু অনেক চেষ্টা করার পরও যদি ঐ জিনিসের মালিক অথবা তার ওয়ারিছদের মধ্য হ'তে কাউকে খুঁজে পাওয়া না যায়– তাহ'লে চুরির মাল ঐ মালের মালিকের নামে আল্লাহর ওয়াস্তে দান করে দিতে হবে। তাহলে ঐ দানের ছাওয়াব ঐ মালিক পরকালে পেয়ে যাবে।

৩৮. জমি আত্মসাৎ করা (غَصْبُ الْأَرْضِ)

জমি আত্মসাৎ করা অর্থাৎ অন্যায়ভাবে অন্যের জমি জোরকরে দখল করে নিয়ে নেওয়া।

সাধারণতঃ যখন মানুষের মন থেকে আল্লাহভীতি উঠে যায় তখন তার শক্তি,বুদ্ধি ও বিবেচনা ইত্যাদি সবই তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিশাপ বা বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। আর সত্যিকার অর্থে তার লজ্জা-শরম, মান-ইয্যত বলতে কিছুই বাকী থাকে না। ফলে তখন সে তার বিদ্যা-বুদ্ধিকে নির্বিচারে মানুষের ওপরে যুলুম-নির্যাতনের কাজে ব্যবহার করে। যেমন কেউ শক্তির বলে অন্যায়ভাবে কাউকে মার-ধোর করে, বা কেউ অন্যায়ভাবে অন্যের টাকা বা সম্পদ ছিনিয়ে নেয়, এমনিভাবে কেউবা অন্যের জমি জোর করে দখল করে নেয় ইত্যাদি। বর্তমান সমাজে এ ধরনের কত যুলুম-নির্যাতন যে চলছে তার হিসাব করা কঠিন। আর এ সমস্ত যুলুম ও নির্যাতনের পরিণাম খুবই ভয়াবহ, খুবই বিপদ জনক। এ ব্যাপারে আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِيْنَ" (بخارى, فتح البارى ٥/١٠٣)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো জমির কিছু অংশ জোর করে দখল করে নিবে, ক্বিয়ামতের দিন এজন্য তাকে সাত তবক যমীনের নীচে পুঁতে দেওয়া হবে" (বুখারী, ফাতহুল বারী ৫/১০৩)। ইয়ালা ইবনু মুররা থেকে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আরো বলেছেন,

"أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ كَلَّفَهُ اللهُ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى آخِرِ سَبْعِ أَرَضِيْنَ ثُمَّ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ" (طبراني, كبير ٢٢/٢٧٠, صحيح الجامع ح/٢٧١٩).

অর্থঃ "যে ব্যক্তি ১বিঘত পরিমাণ কারো জমি জবরদখল করে নিবে, এ কারণে মহান আল্লাহ যমীনের সপ্তস্তর পর্যন্ত তাকে দিয়ে খনন করতে বাধ্য করবেন। অতঃপর ক্বিয়ামতের দিন তা তার গলায় বেড়ী করে রাখা হবে মানুষের মাঝে বিচার কার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত" (ত্বাবারাণী, কাবীর ২২/২৭০, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ২৭১৯)। এছাড়া জমির সীমানা বা আইল পরিবর্তন করা সম্পর্কে মহানবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ" (مسلم مع شرح النووي ١٣/١٤١).

অর্থঃ "যে ব্যক্তি জমির নিশানা বা আইল পরিবর্তন করে একারণে আল্লাহ তার উপরে অভিশাপ দেন" (মুসলিম শরহে নববীসহ ১৩/১৪১)।

৩৯. নিজে ঘুষ খাওয়া এবং অপরকে ঘুষ দেওয়া

(أَخْذُ الرِّشْوَةِ وَإِعْطَاؤُهَا)

বর্তমান বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ দেশের অফিসে-আদালতে, কোম্পানীতে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ঘুষ খাওয়া আর ঘুষ দেওয়ার প্রচলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

ঘুষের অর্থ হলোঃ কারো হক নষ্ট করা অথবা কোন অন্যায় দাবী আদায় করা অথবা বিশেষভাবে কোন সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের জন্য কোন বিচারক, শাসক বা কোন কোম্পানীর ম্যানেজার বা কোন প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে যে টাকা-পয়সা অথবা অন্য কোন সম্পদ দেওয়া হয়– এটাকেই প্রচলিতভাবে ঘুষ বলা হয়। আর ইসলামী শরী'আতে এই ঘুষ দেওয়া বা ঘুষ খাওয়া

দু'টোই বড় ধরনের পাপকাজ হিসাবে গণ্য। কেননা এই ঘুষের ফলে উচ্চ পদস্থ বিচারক, শাসক ও দায়িত্বশীলেরা যেমন, মন্ত্রী, এম.পি, ম্যাজিস্ট্রেট, ডি.সি, ও.সি, চেয়্যারম্যান, মেম্বর ইত্যাদি সকলেই প্রভাবিত হয়। হকদারের প্রতি যুলুম ও অবিচার করা হয়, বিচার ও প্রশাসন ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের অরাজকতা ও অশান্তির সৃষ্টি হয়। আর এ কারণেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বশ্রেণীর মানুষের মাঝে হক ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে বলেছেন,

﴿وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾ (البقرة:١٨٨)

অর্থঃ "তোমরা অন্যায়ভাবে একে-অপরের ধনসম্পদ খেয়ো না, আর জেনে-বুঝে মানুষের ধনসম্পদ হ'তে অন্যায়ভাবে খাওয়ার উদ্দেশ্যে বিচারকদের দরবারে আবেদন পেশ করোনা" (আল-বাক্বারাহ,১৮৮)। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে বলেছেন,

"لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَ الْمُرْتَشِيَ فِيْ الْحُكْمِ" (أحمد ٢/٣٨٧, صحيح الجامع ح/٥٠٦٩). অর্থঃ "বিচার ও ফায়সালার ব্যাপারে ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহণকারী উভয়ের উপরে আল্লাহ তা'আলা লা'আনত করেছেন" (আহমাদ ২/৩৮৭, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৫০৬৯)।

বর্তমান আমাদের দেশে ঘুষের প্রচলন খুবই বেড়ে গেছে। যে ফলে অফিস-আদালতে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এমন অবস্থা হয়েছে যে, অনেক সময় অফিসারদেরকে বা দায়িত্বশীলদেরকে ঘুষ দেওয়া ছাড়া নিজের পাওনা বা অধিকার আদায় করা মোটেই

সম্ভব হয় না অথবা ঘুষ না দিলে যুলুম ও অত্যাচারের শিকার হ'তে হয়। এমতাবস্থায় শুধুমাত্র ঐ ন্যায্য অধিকার আদায় করার জন্য আর ঐ যুলুম ও অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যদি কেউ কাউকে ঘুষ দেয় তাহ'লে এ ক্ষেত্রে ঘুষদাতা উল্লিখিত শাস্তির আওতায় পড়বেনা। (এ বিষয়ে আলেমগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন)।

বর্তমান সমাজে ঘুষের প্রচলন এমন দাঁড়িয়েছে যে, অফিসে-আদালতে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও কোম্পানিতে চাকুরির জন্য একদিকে মন্ত্রী-মিনিষ্টার, এম.পি ও ডি.সি. ও.সি. তথা উচ্চ পদস্থ কারো সুপারিশ অথবা পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুষ দেওয়া ছাড়া যোগ্যতাবলে চাকুরি পাওয়ার দ্বিতীয় কোন পথ খোলা নেই।

৪০.সুপারিশের বিনিময়ে উপহার গ্রহণ করা

(قَبُوْلُ الْهَدِيَّةِ بِسَبَبِ الشَّفَاعَةِ)

মানুষের মান-মর্যাদা ও পদাধিকার হাছেল করা বান্দার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ রাজির অন্যতম। এই অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করা প্রত্যেকের উপর কর্তব্য। মুসলমানদের উপকারে তাদের পদ-মর্যাদাকে কাজে লাগানো উক্ত শুকরিয়ারই অংশবিশেষ। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَّنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ

অর্থঃ "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার ভাইকে উপকার করতে সক্ষম, সে যেন তা করে" (মুসলিম,৪/১৭২৬ পৃঃ)। যে ব্যক্তি তার পদের মাধ্যমে কোন মুসলিম ভাইয়ের যুলুম থেকে রক্ষা করে কিংবা তার কোন কল্যাণ সাধন করে এবং তা করতে গিয়ে কোন হারাম উপায় অবলম্বন করে না বা কারো অধিকার

ক্ষুণ্ন করে না, সে ব্যক্তির নিয়ত বিশুদ্ধ হ'লে মহান আল্লাহর নিকট সে পারিতোষিক পাওয়ার যোগ্য। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

إِشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا (بخاري, مسلم, أبو داود ٥١٣٢)

অর্থঃ "তোমরা সুপারিশ কর, এর বিনিময়ে তোমরা ছওয়াব পাবে" (আবূ-দাঊদ ৫১৩২, বুখারী, মুসলিম, ফাৎহুল বারী ১০/৪৫০পৃঃ)। এই সুপারিশ এবং শালিস-মধ্যস্থতার জন্য কোন বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয নয়। কেননা এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً (عَلَيْهَا) فَقَبِلَهَا (مِنْهُ) فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيْمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا (أحمد ٥/٢٦١, صحيح الجامع, ح/٦٢٩٢).

অর্থঃ "সুপারিশ করার দরুন যে ব্যক্তি সুপারিশকারীকে উপহার দেয় এবং (তার থেকে) সে ঐ উপহার গ্রহণ করে– তাহ'লে সে ব্যক্তি সূদের দ্বারদেশ হ'তে একটি বৃহৎ দ্বার গ্রহণ করল" (আহমাদ ৫/২৬১, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৬২৯২)।

এক শ্রেণীর মানুষ আর্থিক স্বার্থের বিনিময়ে তাদের পদমর্যাদাকে কাজে লাগাতে চায় বা মধ্যস্থতা করতে স্বীকৃত হয়। যেমন সে শর্ত আরোপ করে যে, তার কোন একজন লোককে চাকরি দিতে হবে অথবা কাউকে কোন প্রতিষ্ঠান বা এলাকা হ'তে অন্য প্রতিষ্ঠান বা এলাকায় বদলি করে দিতে হবে, কিংবা কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে চিকিৎসা করে দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এরূপ স্বার্থের শর্তারোপ ও তার সুযোগ গ্রহণ করা হারাম। উপরোক্ত হাদীছই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। বরং যে কোন কিছু গ্রহণ করাই এই হাদীছের বাহ্যিক দিকের আওতায় পড়ে,- পূর্বে কোন কিছুর শর্ত আরোপ না করা হৌক। আসলে ভাল

কাজের কর্মীর জন্য আল্লাহর পারিতোষিকই যথেষ্ট, যা সে ক্বিয়ামত দিবসে পাবে।

এক ব্যক্তি কোন এক প্রয়োজনে হাসান বিন ছাহালের নিকট এসে তাঁর সুপারিশ প্রার্থনা করে। তিনি তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। ফলে লোকটি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগল। তখন হাসান বিন সাহল তাকে বললেন, "কি জন্য তুমি আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছ? আমরা তো মনে করি পদেরও যাকাত আছে যেমন অর্থ-সম্পদের যাকাত আছে" (ইবনুল মুফলিহ, আল-আদাবুশ শারঈয়াহ ২/১৭৬ পৃঃ)।

এখানে এই পার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করা যথার্থ হবে যে, কোন কার্য সিদ্ধির জন্য ব্যক্তি বিশেষকে পারিশ্রমিক দিয়ে নিযুক্ত করা এবং পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ঐ কাজ সম্পন্ন করানো শারঈ শর্তাবলী সাপেক্ষে বৈধমজুরী প্রদান শ্রেণীভুক্ত হবে। পক্ষান্তরে আর্থিক সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে নিজ পদমর্যাদা ও মধ্যস্থতাকে কাজে লাগিয়ে সুপারিশের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এটা নিষিদ্ধ। মূলতঃ উভয় প্রক্রিয়া এক নয়।

৪১. শ্রমিক থেকে ষোলআনা শ্রম আদায় করে তাকে পুরো মজুরী না দেওয়া।

(اِسْتِيْفَاءُ الْعَمَلِ مِنَ الْأَجِيْرِ وَعَدَمُ إِيْفَاءِ أَجْرِهِ)

রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) শ্রমিকের পাওনা দ্রুত পরিশোধ করার জন্য জোর তাকীদ দিয়ে বলেছেন,

أَعْطُوْا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (إبن ماجه ٢/٨١٧, صحيح الجامع ح/١٤٩٣).

অর্থঃ "তোমরা শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার আগেই তার পাওনা পরিশোধ কর" (ইবনু মাজাহ ২/৮১৭, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ১৪৯৩)।

শ্রমিক, কর্মচারী, দিনমজুর যেই হৌক না কেন তার থেকে শ্রম আদায়ের পর যথারীতি তার পাওনা পরিশোধ না করা মহা যুলম। এ যুলম এখন হর-হামেশাই হচ্ছে। শ্রমিকদের প্রতি যুলমের বিচিত্র রূপ রয়েছে। যেমনঃ

১.শ্রমিক স্বীয় কাজের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পেশ করতে না পারায় তার পাওনাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা। এক্ষেত্রে দুনিয়াতে তার হক্ব মাঠে মারা গেলেও ক্বিয়ামতে তা বৃথা যাবে না। ক্বিয়ামতের দিন যালিমের পুণ্য থেকে মাযলুমের পাওনা পরিমাণ পুণ্য প্রদান করা হবে। আর যদি তার পুণ্য শেষ হয়ে যায় তবে মাযলুমের পাপ যালিমের ঘাড়ে চাপানো হবে, তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

২.যে পরিমাণ অংক মজুরী দেওয়ার জন্য চুক্তি হয়েছে তার থেকে কম দেওয়া। এ বিষয়ের সমূহ ক্ষতি প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নিম্নের হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন।

(وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ) অর্থঃ "যারা (পাওনা) পরিমাণে কম দেয় তাদের জন্য দুর্ভোগ রয়েছে" (মুতাফ্‌ফিফীন, ১)। অনেক নিয়োগকর্তা দেশ-বিদেশ থেকে নির্দিষ্ট বেতন বা মঁজুরীর চুক্তিতে শ্রমিক নিয়োগ করে থাকে। তারপর তারা যখন কাজে যোগদান করে তখন সে একতরফাভাবে চুক্তিপত্র পরিবর্তন করে বেতন বা মজুরীর পরিমাণ কমিয়ে দেয়। কিন্তু অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও ঐ সব শ্রমিক তখন কাজ করতে বাধ্য হয়। অনেক সময় শ্রমিকরা তাদের অধিকারের স্বপক্ষে প্রমাণ হাজির করতে পারেনা। তাই তখন কেবল আল্লাহর নিকট অভিযোগ করা ছাড়া তাদের কোন উপায় থাকে না। এক্ষেত্রে যদি নিয়োগ কর্তা মুসলমান ও নিয়োগ

প্রাপ্ত ব্যক্তি কাফির হয় তবে বেতন অর্থাৎ মজুরী হ্রাসে ঐ শ্রমিকের ইসলাম গ্রহণে বাধা সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে ক্বিয়ামত দিবসে ঐ কাফিরের পাপ তাকে বহন করতে হবে।

৩. বেতন বা মজুরী বৃদ্ধি না করে কেবল কাজের পরিমাণ কিংবা সময় বৃদ্ধি করা। এতে

শ্রমিককে তার অতিরিক্ত কাজের পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত করা হয়।

৪. বেতন বা মজুরী পরিশোধে গড়িমসি করা। অনেক চেষ্টা, তদবীর-তাগাদা, অভিযোগ ও মামলা-মোকদ্দমার পর তবেই প্রাপ্য অর্থ আদায় করা সম্ভব হয়। অনেক সময় নিয়োগকারী শ্রমিককে ত্যক্ত-বিরক্ত করার উদ্দেশ্যে টাল-বাহানা করে, যেন সে পাওনা ছেড়ে দেয় এবং কোন দাবী না তুলে চলে যায়। আবার কখনও তাদের টাকা খাটিয়ে মালিকের তহবিল বৃদ্ধি করার নিয়ত থাকে। আর অনেকে তা সূদী কারবারেও খাটায়। অথচ সেই শ্রমিক না নিজে খেতে পাচ্ছে, না নিজের পুত্র-পরিজনদের জন্য কিছু পাঠাতে পারছে। অথচ তাদের মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার জন্যই সে দূর দেশে পড়ে আছে। এজন্যই এ সকল যালিমের জন্য এক কঠিন দিনের শাস্তি অপেক্ষা করছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

" ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِيْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا وَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ"

অর্থঃ "ক্বিয়ামতের দিন আমি ৩ শ্রেণীর মানুষের বিরুদ্ধে বাদী হব। ১. যে ব্যক্তি আমার অনুগত হওয়ার পর বিশ্বাসঘাতকতা করে। ২. যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন বা মুক্ত লোককে ধরে বিক্রয় করে। ৩. যে ব্যক্তি কোন মজুরকে

নিয়োগের পর তার থেকে পুরো কাজ আদায় করেও তার পাওনা পরিশোধ করে না। (বুখারী, ফাতহুল বারী ৪/৪৪৭ পৃঃ)।

৪২. সন্তানদেরকে উপহার প্রদানে সমতা রক্ষা না করা

(عَدَمُ الْعَدْلِ فِي الْعَطِيَّةِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ)

বর্তমান আমাদের সমাজে এমন অনেক পিতা-মাতা আছেন, যারা এক সন্তানকে কিছু 'হিবা' বা উপহার দিলে অন্যান্য সন্তানকে দেন না। অথচ ইসলামী শরী'য়াতের নিয়ম হলো, বিশেষ কোন উপহার সন্তানদের সবাইকে সমানভাবে দিতে হবে,আর তা নাহ'লে কাউকে কিছুই দেওয়া যাবে না। ইসলামী বিধান লংঘন করে কোন বিশেষ সন্তানকে এভাবে কিছু দেওয়া আর অন্যদেরকে বঞ্চিত করা মোটেই ঠিক নয়। শার'ঈ কারণ ব্যতীত এরূপ দান করলে তা হারাম বলে গণ্য হবে। শার'ঈ কারণ বলতে, সন্তানদের মধ্য হ'তে কারো এমন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, যা অন্যদের নেই। যেমন একজন ছেলে অসুস্থ, কিংবা সে বেকার, অথবা সে ছাত্র, কিংবা সংসারে তার সদস্য সংখ্যা অনেক বেশী, ফলে তার খরচের পরিমাণ অনেক বেশী। পিতা এরূপ শার'ঈ কারণবশতঃ কোন সন্তানকে কিছু দেওয়ার সময় এরূপ নিয়ত করবে যে, অন্য কোন সন্তানদের যদি এরূপ প্রয়োজন দেখা দেয় তাহ'লে তাকেও তিনি তার প্রয়োজন মত দিবেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ (المائدة:٨)

অর্থঃ "তোমরা সুবিচার কর। ওটা আল্লাহভীতির অধিকতর নিকটবর্তী। আর তোমরা মহান আল্লাহকে ভয় কর" (আল-মায়েদাহ, ৮)। এ প্রসঙ্গে বিশেষ দলীল হলো রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর হাদীছ, একদা নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) এর পিতা তাকে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর দরবারে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'আমি আমার এই ছেলেকে একটা দাস বা চাকর দান করেছি'। একথা শুনে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) তাকে বলেছিলেন, "তোমার সকল ছেলেকে কি তার মত একটা করে দাস দান করেছ? তিনি বললেন, না। তখন রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) তাকে বললেন, "তাহ'লে উক্ত দান ফেরত নাও"। এ হাদীছটি অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছে যে-"তোমরা মহান আল্লাহকে ভয় কর আর তোমার সন্তানদের মাঝে সুবিচার কর"। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বাড়ী ফিরে এসে ঐ দাস ফেরত নেন। এ হাদীছটি অপর এক বর্ণনায় এসেছে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) তাকে বলেছিলেন, "তুমি এ ব্যাপারে আমাকে সাক্ষী বানাইও না। কেননা যুলুমের সাক্ষী আমি হ'তে পারি না" (মুসলিম ৩/১২৪৩, ফাতহুল বারী ৫/২১১)।

কোন কোন পিতাকে দেখা যায় যে, তারা বিশেষ কোন ছেলেকে সামান্য কারণেই কোন বিষয়ে অগ্রাধিকার দেয়– অথচ এ ব্যাপারে তারা আল্লাহকে মোটেই ভয় করে না। এর ফলে ছেলেদের মাঝে মন কষাকষি সৃষ্টি হয়। তারা একে অপরের প্রতি শত্রু ও বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। কোন কোন পিতা কখনো কোন সন্তানের ভিতরে পিতৃকুলের আকৃতি পাওয়ার কারণে এভাবে তাকে বিশেষভাবে অনেক কিছু দান করে থাকে। আবার অন্য সন্তানের ভিতরে মাতৃকুলের আকৃতি পাওয়ার কারণে তাকে

বঞ্চিত করা হয়। আবার কোন সময় এক স্ত্রীর সন্তানকে দান করা হয়, আর অন্য স্ত্রীর সন্তানদেরকে মাহরূম করা হয়। আবার অনেক সময় স্ত্রীদের মধ্য হ'তে কোন একজন স্ত্রীর ছেলে-মেয়েদেরকে বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানো বা পড়ানো হয়, আর অন্য স্ত্রীর ছেলে-মেয়েদেরকে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানো বা পড়ানো হয়। ইসলামী শরী'আতে এ ধরনের অবিচার একদিকে হারাম, আর অপরদিকে এর ফলাফল বড়ই বিপদজনক ও অশান্তিকর। কারণ অনেক সময় ঐ সমস্ত বঞ্চিত ছেলেরাই ভবিষ্যতে তাদের পিতার সাথে খারাপ ব্যবহার করে থাকে। আর এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُوْنُوْا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً" (أحمد ٤/٢٦٩, صحيح مسلم ح/ ١٦٢٣).

অর্থঃ "তোমার সন্তানেরা সকলেই তোমার সাথে সমানভাবে সদাচরণ করুক তাতে কি তুমি খুশী নও"? (আহমাদ ৪/২৬৯, ছহীহ মুসলিম হাদীছ নং ১৬২৩)। সুতরাং সন্তানদের প্রতি দান-দক্ষিনায় সমতা রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য।

৪৩. একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ভিক্ষা করা

(سُؤَالُ النَّاسِ الْمَالَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ)

একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ভিক্ষা করা সম্পর্কে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيْهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ قَالُوْا وَمَا الْغِنَى الَّذِيْ لاَ تَنْبَغِيْ مَعَهُ الْمَسْئَلَةُ ؟ قَالَ: قَدْرُ مَا يُغَدِّيْهِ وَ يُعَشِّيْهِ" (أبوداود ٢٨١/٢, صحيح الجامع ح/٦٢٨٠).

অর্থঃ "যে ব্যক্তির নিকটে অভাব মোচনের মত সামগ্রী অর্থাৎ কোন জিনিসপত্র আছে তা সত্ত্বেও সে ভিক্ষা করে বেড়ায়— তাহ'লে এ জন্যে সে জাহান্নামের অঙ্গারকেই কেবল বৃদ্ধি করল। একথা শুনে ছাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) তাহ'লে কতটুকু সম্পদ থাকলে ভিক্ষা করা উচিত নয়? উত্তরে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বললেন, সকাল-সন্ধ্যায় খাওয়া চলে এমন পরিমাণ সম্পদ থাকলে ভিক্ষা করা উচিত নয়" (আবূ-দাঊদ ২/২৮১, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৬২৮০)। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আরো বলেছেন,

"مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوْشًا أَوْ كُدُوْشًا فِي وَجْهِهِ" (أحمد ١/٣٨٨، صحيح الجامع ح/٦٢٥٥).

অর্থঃ "অভাবমুক্ত হয়েও যে ব্যক্তি ভিক্ষা করে, ক্বিয়ামতের দিন সে মুখে গোশত শূন্য অবস্থায় উঠবে" (আহমাদ ১/৩৮৮, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৬২৫৫)।

অনেক ভিক্ষুক মাসজিদে আল্লাহর বান্দাদের সামনে দাঁড়িয়ে একাধারে তাদের অভাব-অভিযোগের ফিরিস্তি অর্থাৎ বিস্তারিত বর্ণনা দিতে থাকে। আর অনেকে এ ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলে আর তাদের পরিচয় পত্র তুলে ধরে। অনেকে আবার মনগড়া কিছ্ছা কাহিনী বলে ভিক্ষা করে। আবার কোন কোন ভিক্ষুক

নিজ পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন মাসজিদে ও জনসমাবেশে ভাগ করে দেয়। আর দিনের শেষে তারা সকলেই একত্রিত হয়ে নিজেদের আয় কত হলো সেটা গণনা করে দেখে। এভাবে তারা যে কত টাকা-পয়সা জমিয়েছে তা একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। পরিশেষে যখন তারা মৃত্যু বরণ করে, তখন জানা যায় কী পরিমাণ টাকা-পয়সা তারা রেখে গেছে। (বর্তমানে এক শ্রেণীর দুনিয়াদার ও নিচুমনের অধিকারী যারা আরব দেশগুলিতে বিশেষ করে সাউদী আরব, কুয়েত, কাতার ও বাহরাইন ইত্যাদি দেশে ভিক্ষুকদের দ্বারা ভিক্ষা করিয়ে পয়সা কামানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গরীব দেশ থেকে ল্যাংড়া, কানা, খোঁড়া এ ধরনের হাজার হাজার ভিক্ষুককে আরব দেশগুলিতে নিয়ে আসার কাজে খুব ব্যস্ত আছে- অনুবাদক।

পক্ষান্তরে প্রত্যেক সমাজে এমন কিছু কিছু লোক আছে যারা প্রকৃতপক্ষেই অভাবী। যাদের সংযমী মনোভাব দেখে তাদের অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে ধনী বলেই মনে করে। তারা কাকুতি-মিনতি করে মানুষের কাছে কিছু চাইতে লজ্জাবোধ করে, ফলে তারা মানুষের কাছে কিছুই চায়না। এ কারণে তাদের অবস্থা সম্পর্কে সমাজের দায়িত্বশীলরা জানতে পারেনা, ফলে তারা সমাজের মানুষের নিকট হ'তে কোন সাহায্য সহযোগিতাও পায়না। এমতাবস্থায় সমাজের ধনী, দানশীল এবং বায়তুল মাল আদায়কারী ও বন্টনকারীদের উপর বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে- তারা যেন ঐ সমস্ত সংযমী মনোভাবসম্পন্ন অভাবী ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখে।

৪৪. ঋণ পরিশোধ করার ব্যাপারে গড়িমসি করা

(اَلاِسْتِدَانَةُ بِدَيْنٍ لاَ يُرِيْدُ وَفَاءَهُ)

মহান রাব্বুল আলামীনের নিকটে বান্দার হক অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর হক নষ্ট করলে তওবার মাধ্যমে ক্ষমা পাওয়া যায়। কিন্তু কোন মানুষের হক নষ্ট করলে সেই মানুষের নিকট হ'তে মাফ চেয়ে না নেওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মাফ করবেন না। ক্বিয়ামতের দিন টাকা-পয়সার কোন কারবার সেখানে থাকবে না। সেদিন হকদারের পাপ হক আত্মসাৎকারীকে দেওয়া হবে। আর শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন হ'লে হক আত্মসাৎকারীর নেকী হকদারকে দেওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوْا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (النساء:٥٨)

অর্থঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা আমানতকে তার প্রাপকের নিকট যথাযথভাবে পৌছে দিবে" (আন-নিসা,৫৮)। বর্তমান সমাজে ঋণ গ্রহণ করা একটি সাধারণ ও গুরুত্বহীন বিষয় বলে অনেকে মনে করে। অনেকে অভাবের জন্য নয়; বরং নিজের ঠাট-বাট মানুষের সামনে প্রকাশ করার জন্য নতুন নতুন বাড়ীগাড়ী, ঘরের আসবাবপত্র ইত্যাদি কিনার জন্য বিভিন্নভাবে বিভিন্নজনের নিকট হ'তে ঋণ নিয়ে থাকে। যেমন-অনেক সময় এরা বিভিন্ন জিনিসপত্র বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হ'তে বা বিভিন্ন ব্যাংক হ'তে কিস্তিতে বেচা-কেনা করে থাকে সুদের সাথে জড়িত থাকার কারণে তা পরিষ্কার হারাম।

সাধারণতঃ ঋণ পরিশোধের ব্যাপারটাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব না দিলে সেখানে অবশ্য অবশ্যই টালবাহানা ও গড়িমসির সৃষ্টি হবে। আর এ গড়িমসির ফলে অর্থাৎ যথা সময়ে ঋণ দাতাকে ঋণ পরিশোধ না করলে অনেক সময় ঋণ দাতাকে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। এর শোচনীয় ও ভয়াবহ পরিণতি বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيْدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ" (بخاري، فتح الباري ٥/٥٤).

অর্থঃ "যে ব্যক্তি যথাযথভাবে ঋণ পরিশোধের নিয়তে মানুষের অর্থ বা সম্পদ গ্রহণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার পক্ষ থেকে সেই ঋণ নিজেই পরিশোধ করে দেন। আর যে ব্যক্তি যথাযথভাবে ঋণ পরিশোধ করার নিয়ত না করেই ঋণ গ্রহণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ঋণ পরিশোধ করার তাওফীক্ব দেন না।" (বুখারী, ফাতহুল বারী ৫/৫৪)

বর্তমান সমাজের অনেক মানুষই ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে খুবই উদাসীন। তারা এটাকে বড় গুরুত্ব দেয়না। অথচ মহান আল্লাহর নিকটে এই ঋণ পরিশোধের ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি আল্লাহর রাস্তায় শহীদদের এতসব মর্যাদা ও অগণিত ছাওয়াব থাকা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধের দায় থেকে পরিত্রাণ অর্থাৎ মুক্তি পাবে না। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ التَّشْدِيْدِ فِي الدَّيْنِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ" (النسائي، صحيح الجامع ح/ ٣٥٩٤).

অর্থঃ "সুবহা-নাল্লাহ! ঋণ প্রসঙ্গে কতবড় কঠোর বাণী আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন। যে আল্লাহর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, ঋণগ্রস্ত অবস্থায় কেউ যদি আল্লাহর পথে শহীদ হয়-এর পর সে যদি আবার জীবিত হয়, এরপর সে যদি আবার শহীদ হয় এবং আবার জীবিত হয়, এরপর যদি সে আবার শহীদ হয় তবুও তার ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না" (নাসায়ী, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৩৫৯৪)। এরপরেও কি ঋণ পরিশোধ করার ব্যাপারে টালবাহানাকারী মতলববাজদের হুশ ফিরবে না?

৪৫. হারাম খাওয়া (أَكْلُ الْحَرَامِ)

বলা যেতে পারে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ভয় করে না– সে কোথা থেকে অর্থ উপার্জন করল আর কোথায় বা অর্থ ব্যয় করল তার কোন পরোয়া সে মোটেই করে না। বলা যেতে পারে দুনিয়ার জীবনে তার মাত্র একটাই উদ্দেশ্য– সেটা হলো অর্থ বা সম্পদ জমা করা- তা হারাম অবৈধ যে পথেই হোক না কেন। আর এ জন্য সে সুদ-ঘুষ, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, আত্মসাৎ, হারাম দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় অর্থাৎ হারাম ব্যবসা-বাণিজ্য, ইয়াতিমের মাল খাওয়া, জ্যোতিষী বিদ্যা, যিনা-ব্যাভিচার, গান-বাজনা ইত্যাদি হারাম কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন, এমনকি মুসলমানদের সরকারী বায়তুল মাল কিংবা জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ করা, বা কোন মানুষকে বিপদে ফেলে তার ধনসম্পদ সুকৌশলে হস্তগত করা, ভিক্ষা করা ইত্যাদি যে কোন উপায়ে অর্থ উপার্জন করে। এরপর সে ঐ অর্থ হতে খায়, পরিধান করে, ঘর-বাড়ী তৈরী করে কিংবা বাড়ী ভাড়া নিয়ে দামী দামী আসবাব

পত্র দিয়ে বাড়ী সাজায়। এভাবে হারাম অর্থ দিয়ে সে নিজে উদর পূর্ণ করে ও জীবন-যাপন করে। এভাবে হারাম খাওয়ার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ" (الطبراني، صحيح الجامع ح/٤٤٩٥).

অর্থঃ "মানুষের যে গোশত হারাম কর্মকাণ্ড বা হারাম খাদ্যদ্রব্য হ'তে উৎপন্ন হয়েছে, জাহান্নামের আগুনে পুড়ানোর জন্য তা সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত" (আত-ত্বাবারাণী, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৪৪৯৫)। এছাড়া ক্বিয়ামতের দিনেও তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কোথা থেকে এবং কিভাবে সে ধন-সম্পদ উপার্জন করেছে আর কোথায় সে এই ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে। অতএব এই সমস্ত হারাম খাওয়া লোকদের জন্য পরকালে শুধু কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে।

একটা পরিবারের হারাম খাওয়া থেকে তওবা করার ঘটনা

(تَوْبَةُ أُسْرَةٍ كَامِلَةٍ عَنْ أَكْلِ الْحَرَامِ عَلَى يَدِ أَحَدِ أَبْنَائِهَا)

একটা পরিবার সম্পূর্ণ হারাম উপার্জন ও হারাম খাওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আল্লাহর মেহেরবাণীতে ঐ পরিবারের একটি ছেলের দ্বারা পরিবারের সকলেই হারাম খাওয়া থেকে তওবা করে। ঐ ছেলের বক্তব্যটাই নিচে উল্লেখ করা হলো। আমি আমার পরিবারের সাথে মিশরের রাজধানী কায়রোর এক উন্নত এলাকায় শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছিলাম। বড়

আফসোসের বিষয়! আমাদের পারিবারিক অবস্থা এমন ছিল যে, খাওয়ার টেবিলে মদ সর্বদা মওজুদ থাকত। আর আমার পিতা পুরা মাত্রায় সুদ খেতেন। আমাদের ঐ বাড়ীর পার্শ্বেই এক বড় মসজিদ ছিল। একদিন আমি আমাদের বাড়ীর বেলকুনিতে বসে আছি, এমন অবস্থায় মাসজিদের ইমাম সাহেবের বক্তব্য শুনে আমি বাড়ী হতে নেমে মাসজিদে গেলাম। মাসজিদে গিয়ে ইমাম সাহেবের বক্তব্যে শুনতে পেলাম যে, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ"

অর্থঃ "মানুষের যে গোশত হারাম কর্মকাণ্ড বা হারাম খাদ্যদ্রব্য হ'তে উৎপন্ন হয়েছে, জাহান্নামের আগুনে পুড়ানোর জন্য তা সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত" (আত-ত্বাবারাণী, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৪৪৯৫)। ইমাম সাহেব এই হাদীছের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। ইহা শ্রবণ করার পর আমি বাড়ীতে যেয়ে বাড়ীর সবার সাথে মিলে-মিশে খাওয়া দাওয়া সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে একাকী নিম্ন মানের খাদ্য খেয়ে কোন প্রকারে দিন কাটাচ্ছিলাম। এরপর আমার অনুভূতির কথা আমার মাকে বুঝালাম। এরপর মাকে বললাম যে, আমার পিতা ঐ হারাম উপার্জন ছেড়ে দিয়ে তওবা না করা পর্যন্ত আমি তাঁর কোন জিনিসই খাব না।

এরপর আমার মা ও বোন আমার কথায় ঐক্যমত্য পোষণ করলেন। কিন্তু আমার পিতা তাঁর কর্মকাণ্ডের উপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকলেন। এরপর আমি খুব নরমভাবে তাঁকে বুঝাতে লাগলাম, আমার মাও তাকে বুঝাতে লাগলেন এবং তাঁর জন্য দু'আ করতে লাগলেন। এরপর আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে আমার পিতা মদ, সুদ ও হারাম কারবার সব ছেড়ে দিলেন।

এরপর তিনি আমাদের সকলকে তাঁর স্নেহ-মমতার বন্ধনে আবদ্ধ করলেন। আর ঘোষণা করে দিলেন যে, আজ হ'তে ঐ সমস্ত হারাম কার্য্যাবলী হ'তে আমি চিরতরে তওবা করলাম, যে সমস্ত কাজ আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে বিভিন্ন প্রকার হারাম উপার্জন এবং হারাম খাওয়া থেকে তওবা করার তাওফীক্ব দান কর। আমীন।

৪৬. ধূমপান করা (اَلتَّدْخِيْنُ)

(মুফতী শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ)

প্রশ্নঃ সম্মানিত শায়খের কাছে আমার জিজ্ঞাসা যে- ধূমপান ও হুক্কা টানা সম্পর্কে ইসলামী বিধান কী? এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীস থেকে কোন দলীল-প্রমাণ আছে কি?

উত্তরঃ ধূমপান করা হারাম। অনুরূপভাবে হুক্কা টানাও হারাম। ধূমপান হারাম হওয়ার দলীল সমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ- ১. মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَلَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا﴾ (النساء: ٢٩)

অর্থাঃ "তোমরা তোমাদের নাফসকে হত্যা করোনা। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু" (সূরা নিসাঃ ২৯)। ২. আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (البقرة: ١٩٥)

অর্থাৎ "তোমরা নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসে পতিত করোনা"(সূরা বাক্বারাহ, ১৯৫)। চিকিৎসাশাস্ত্র প্রমাণ করেছে যে,

ধূমপান একটি ক্ষতিকর বস্তু। আর যে সকল বস্তু স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর, ইসলামী বিধান তাকে হারাম করেছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ (النساء:٥)

অর্থাৎ "তোমরা তোমাদের সম্পদ নির্বোধদেরকে প্রদান করোনা। যে সম্পদকে আল্লাহ্ পাক তোমাদের জীবন-যাত্রার অবলম্বন করেছেন"(সূরা নিসাঃ ৫)।

উপরোক্ত আয়াতে ধূমপায়ী নির্বোধদেরকে আমাদের সম্পদ থেকে প্রদান করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা তারা সম্পদের অপচয় করবে, আর বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, হুক্কা টানায় ও ধূমপানে সম্পদের অপচয় হয়। আর অত্র আয়াত অপচয়, অপব্যয় ও বিপর্যয় সৃষ্টি না করার প্রমাণ বহন করে। এছাড়াও রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) সম্পদ বিনষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। ধূমপানে সম্পদের অপচয় ও অপব্যয় হয়। আর এ অপব্যয়ই হচ্ছে সম্পদ বিনষ্ট করা। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন, "لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ"

অর্থা "তোমরা নিজেদের ক্ষতিসাধন করোনা এবং অপরের ক্ষতি সাধনও করোনা"। ধূমপান এমনই এক বিষয় যা গ্রহণের কারণে নিজের ক্ষতির সাথে সাথেই পার্শ্ববর্তী মানুষের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া ধূমপায়ী ধূমপানের মাধ্যমে সম্পদ হারিয়ে নিজেকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় এবং নিঃস্ব অবস্থায় দুনিয়াতে বসবাস করে। অতএব যে নিজেকে ধূমপানে অভ্যস্ত করলো, সে ধনবান থেকে নিঃস্বে পরিণত হলো। (মুফতী শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উসাইমীন রাহিঃ)

ধূমপানের অপকারিতা সম্পর্কে আমরা যা জানি

১- ধূমপান একটি অপবিত্র, দুর্গন্ধময় ও ক্ষতিকারক বস্তু।

২- ধূমপান ক্যান্সার, যক্ষা প্রভৃতির মত ধ্বংসাত্মক রোগ সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

৩- ধূমপায়ী স্বয়ং নিজের নাফসকে ধ্বংস করে দেয়।

৪- ধূমপান নিজের ক্ষতির সাথে-সাথে পার্শ্ববর্তী লোকেরও কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৫- ধূমপান করার অর্থই হচ্ছে নেশাদার বা হারাম জিনিষ খেয়ে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করা, ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের নাফসকে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে সহযোগিতা করা আর অর্থের অপচয় করা। এ সমস্ত কাজের প্রত্যেকটাই শয়তানী কাজের অন্তর্ভুক্ত।

৬- ধূমপানকারী নিজে প্রকাশ্যভাবে গোনাহ করে থাকে আর সে এ গুনাহের কাজের বিস্তার ঘটিয়ে থাকে। সেহেতু ধূমপানের গোনাহ বড় ধরনের গোনাহ। অতএব ধূমপানকারীকে অতিশীঘ্রই তাওবা করা উচিত।

৭- ধূমপানকারী সম্পদ ধ্বংসকারী– যাকে আল্লাহ্ মোটেই পছন্দ করেন না।

৮- ধূমপান মানুষের হৃদযন্ত্রকে অকেজো করে ফেলে। আর শরীরের শক্তিকে দুর্বল করে দেয়।

৯- এর দ্বারা দাঁতগুলো হলুদ হয়ে যায়, ঠোঁট দুটি কালো হয়ে যায়, চেহারার লাবন্য নষ্ট হয়ে যায়, দৃষ্টিশক্তি কমে যায় আর স্নায়ুর দুর্বলতা দেখা দেয় ইত্যাদি।

১০–এর দ্বারা কফ, কাশি এবং বক্ষব্যাধির সৃষ্টি হয়।

১১–এর কারণে যক্ষা ও হৃদ রোগ হয়। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুও ঘটে।

১২–খাবারে রুচি নষ্ট করে ফেলে আর হজমে ব্যাঘাত ঘটায়।

১৩–এর দ্বারা রক্ত চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয় আর হৃদযন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যাবলীতে গোলযোগ দেখা দেয়।

১৪–সুরুচিশীল লোকদের নিকট ধূমপান একটি অপবিত্র ও ঘৃণিত বস্তু বলে গণ্য।

১৫–ধূমপান একটি নেশাদার বস্তু যা পরিষ্কার হারাম।

১৬–ধূমপান একটা দুর্গন্ধময় বস্তু। যারা সিগারেট খায়না তারা এর দ্বারা খুবই কষ্ট পায়,

অপরদিকে সম্মানিত ফেরেশতাকুলও খুবই কষ্ট পান।

১৭– এটা দ্বীন-দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য বড় ক্ষতিকর।

১৮– বর্তমান বড় বড় দেশগুলি কঠোরভাবে ধূমপান বিরোধী অভিযান চালাচ্ছে। সিগারেটের মোড়কে লেখা হচ্ছেঃ 'ধূমপানে বিষপান', 'ধূমপান স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর' ইত্যাদি।

১৯– এর ফলে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়।

২০–ধূমপানের বিজ্ঞাপন যেন বলে,'আপনার ফুলদানী হোক ছাইদানী'।

২১–ধূমপানের বিজ্ঞাপন স্বাস্থ্য ও সম্পদ নষ্টের বিজ্ঞাপন।

২২–ধূমপান ইসলামী শরী'য়াত ও সুস্থ বিবেকের দৃষ্টিতে হারাম। অতএব ধূমপানকারীর সংগ বর্জন করুন আর মহান আল্লাহর নিকট তাওবা করুন।

২৩–ধূমপান করার আগে ভেবে দেখুন– এটা হারাম না হালাল? উপকারী না ধ্বংসকারী? পবিত্র না অপবিত্র? চিন্তা করলে অবশ্যই জানতে পারবেন যে, এটা হারাম, ক্ষতিকর এবং অপবিত্র ।

২৪–বাহ্যিকভাবে ধূমপানের মাধ্যমে সমাজের লোকদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দিকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়।

২৫–মোট কথা 'একজন ধূমপায়ী' তার ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন এবং

সুশীল সমাজের নিকট–সর্বোপরি মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট অর্থ অপচয়কারী,

বদ অভ্যাসের দাস ও হারাম খোর হিসাবে পরিচিত।

২৬–বাস্তবতার আলোকে আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা হলোঃ ক্ষেতে খামারে, মাঠে-ময়দানে বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি ও ফসলাদি যা গরু-ছাগল, ভেড়া-মহিষ, হাস-মুর্গী নষ্ট করে, বা খেয়ে ফেলে– যার ফলে চাষী ভাইয়েরা ঐ সমস্ত জানোয়ারের ক্ষয় ক্ষতির হাত থেকে তাদের ফসলাদিকে রক্ষা করার জন্য মাঠের ক্ষেত এবং

বাড়িতে খামারে রাখা ফসলাদি ঘিরে রাখার ব্যবস্থা করে থাকে। এখানে লক্ষণীয় যে, পান ও বিড়ি-সিগারেটের তামাক এমনই অপবিত্র ও ক্ষতিকারক বস্তু– যার ফলে কোন জীব জানোয়ার ও পশু-পাখী পর্যন্ত তা খায় না। ফলে বাংলাদেশের বৃহত্তর রংপুরে মাঠের হাজার হাজার বিঘা তামাকের ক্ষেত ও বাড়ির খামারে রক্ষিত তামাক ঘিরে রাখার কোন প্রয়োজন হয়না। অপরদিকে সৃষ্টির সেরা মানুষ ঐ হারাম ও অপবিত্র জিনিস খেয়ে নিজে অর্থনৈতিক ও, শারীরিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আর সর্বোপরি ধর্মীয় অনুভূতিকে ধংস করছে। এর পরেও ওহে ধূমপায়ী ভাই! আপনি কি বিষয়টা একটু ভেবে দেখবেন না?

২৭-ধূমপায়ী ভাইদের মধ্য হতে অনেকেরই ধারণা যে, টয়লেটে বসে সিগারেট টানলে তাতে পায়খানা ভাল ক্লিয়ার হয়। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা তথা বদ অভ্যাস মাত্র। আর এটা নিঃসন্দেহে শয়তানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। বাস্তবতার আলোকে দেখা যায় যে, একজন ধূমপায়ী সিগারেট জ্বালিয়ে টয়লেটে ঢুকার পর কমপক্ষে ১০মিনিট যাবৎ টয়লেটের কাজ ও সিগারেট টানার কাজ শেষ করে যখন বের হয়ে আসল– তখন ঘটনা ক্রমে অন্য একজন অধূমপায়ী ব্যক্তি প্রয়োজন মিটাতে ঐ টয়লেটে ঢুকেই বিকট দুর্গন্ধের মোকাবিলা করে টয়লেটের কাজ সমাধা করতে হিমসিম খেয়ে যায়। কেননা চার দেয়াল বেষ্টিত ছোট্ট টয়লেটে তখন একদিকে সিগারেটের বিষাক্ত ধুয়া অপরদিকে টয়লেটের দুর্গন্ধ একত্রিত হয়ে বিকট দুর্গন্ধময় গ্যাসে ভরে

রয়েছে। ফলে টয়লেটের দুর্গন্ধ চাপা পড়ে গিয়ে এখন শুধু সিগারেটের বিষাক্ত গ্যাসই ঐ অধূমপায়ী ব্যক্তির কাছে অনুভূত হচ্ছে। যার ফলে টয়লেটের কাজ সমাধা করতে সে এখন বড় বিপদে পড়েছে। এক্ষণে বিশেষ করে ধূমপায়ী সুধী মহলের নিকট প্রশ্ন যে, ঐ টয়লেটে আপনার ধূমপান করার কারণে ঐ দুর্গন্ধময় বিষাক্ত গ্যাসের ভিতর কমপক্ষে ১০মিনিট সময় আপনি কেমন করে বসে থাকেন? শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে ঐ বিষাক্ত গ্যাস অবশ্যই আপনার শরীরের ভিতর প্রবেশ করে– যা আপনার শরীরের জন্য কতটুকু কল্যাণকর একটু ভেবে দেখবেন কি?

২৮-ক্ষেতে-খামারে, মাঠে-ময়দানে, অফিসে-আদালতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, মিল-কল কারখানায় – তথা সকল প্রকার কর্মস্থলে কর্মরত ভাইদের মধ্যহতে অনেকেই ধারণা করেন যে, ক্লান্তি -শ্রান্তি ও দুঃশ্চিন্তা দূর করার জন্য ধূমপান বড় উপকারী। মাঝে মাঝে একটু ধূমপান করে নিলে ক্লান্তি-শ্রান্তি ও দুঃশ্চিন্তা দূর হয়, ফলে কর্মের তৎপরতা বা গতি বৃদ্ধি পায়। ধূমপায়ীদের এই যুক্তি অগ্রহণযোগ্য। কেননা বাস্তবতার আলোকে ধূমপানের মাধ্যমে যদিও সাময়িক কিছুটা উপকার অনুভূত হয় ধরে নেওয়া যায়– তবে বিচক্ষণতার দ্বারা যাচাই বাছাই করে দেখতে হবে যে, এই ধূমপানের দ্বারা উপকার বা লাভের পরিমাণ কতটুকু আর ক্ষতির পরিমাণ বা কতটুকু? বলা যেতে পারে যে, ধূমপানের দ্বারা যদি ১ আনা পরিমাণ উপকার বা লাভ হয়– তাহলে বাকী ১৫ আনাই ক্ষতি সাধিত হয়। তাহলে এখন

আপনি আপনার সুস্থ বিবেকের কাছে প্রশ্ন করুন যে, আপনি কি ১ আনা লাভ করতে যেয়ে ১৫ আনাই ক্ষতি স্বীকার করবেন। আর এজন্যেই মদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, "মদের ভিতর মানুষের জন্য সামান্য পরিমাণ উপকার আছে– তবে ক্ষতির পরিমাণ অনেকগুণ বেশী"। আর এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা মদ পান করা মানুষের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।

এখন কথা হলো– কর্মের মাঝে ক্লান্তি-শ্রান্তি ও দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য ইসলামী বিধান মুতাবিক 'মিসওয়াক' করা, 'উয' করা বা 'উযূ করে দু'রাক'আত নামায পড়া', গরম দুধ ও চা পান করা বা কিছু নাশতা করা– ইত্যাদি মাধ্যমগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে। তাই বলে তো ক্লান্তি-শ্রান্তি ও দুশ্চিন্তা দুর করার অজুহাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল প্রদর্শিত হালাল পদ্ধতিগুলি বাদ দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিষেধকৃত হারাম বস্তুগুলি খাওয়া, এটা কেমন ধরণের ঘৃণিত ও পাপের কাজ? একবার ভেবে দেখুনতো। প্রকাশ থাকে যে, পানের সাথে যে সমস্ত জর্দা, বা কাঁচা তামাক খাওয়া হয়, এমনিভাবে যে সমস্ত গুল ব্যবহার করা হয় মোটকথা যার দ্বারা নেশা হয় এ ধরণের সমস্ত জিনিস খাওয়া বা ব্যবহার করা হারাম। কেননা বাস্তবে দেখা গেছে যে, একজন পানে তামাক খাওয়ায় অভ্যস্ত– কিন্তু ঘটনা ক্রমে যদি সে তামাকের পরিমাণ একটু বেশী মুখে দিয়ে ফেলে তাহলে অবশ্যই সে মাথাঘুরে পড়ে যাবে। অপরদিকে একজন অনভ্যস্ত ব্যক্তি সে তো পানের তামাক কিছুটা মুখে দিয়ে

চিবাতেই সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরে পড়ে যেয়ে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হবে। অতএব এগুলির সবই খাওয়া ও ব্যবহার করা হারাম। এখন বলা যেতে পারে যে, বিড়ি সিগারেটের তামাক যেটা বিশেষ প্রক্রিয়ায় আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে তার বিষাক্ত ধূয়া টানা হয়, আর পানের তামাক যা শুকনা তামাক, যাকে কাঁচা পানের সাথে চিবিয়ে তার বিষাক্ত স্বাদ গ্রহণ করা হয়, এদু'টি পদ্ধতির মাঝে কোনই পার্থক্য নেই, এ যেন একই টাকার এপিঠ ওপিঠ। অতএব সিগারেট ও হুক্কা টানা এবং পানের তামাক, জর্দা ও গুল খাওয়া ও ব্যবহার করা ইসলামী শরী'য়াতে সবই হারাম। কেননা জনাব রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন

"كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" (مسلم)

অর্থঃ"প্রত্যেক নিশাদার বস্তুই হলো মদ, আর প্রত্যেক নিশাদার বস্তুই হলো হারাম"(মুসলিম)।

"مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ" (أَحْمَدُ)

তিনি আরো বলেছেন, "যে বস্তুর বেশী পরিমাণ নেশা সৃষ্টি করে তার কম পরিমাণও হারাম" (আহমাদ)।

২৯-প্রকাশ থাকে যে, বেশ কয়েকটি হাদীছের আলোকে এটাই প্রমাণিত যে, ইসলামী শরীয়াত যে সমস্ত বস্তু খেতে, পান করতে এবং ব্যবহার করতে নিষেধ করেছে- সেই সমস্ত বস্তুর মূল্য গ্রহণ করা এবং সেই সমস্ত বস্তু দিয়ে ব্যবসা করাও হারাম। এ হিসাবে বিড়ি, সিগারেট এবং পানের

তামাক ও জর্দা এ জাতীয় বস্তু বিক্রয় করাও হারামের ভিতর গণ্য। অতএব সাবধান!

৩০-কিছুদিন আগে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ মুশাররাফ হুসাইন বাংলাদেশের সংসদ অধিবেশনে ধূমপানের অপকারিতা ও তার ক্ষতিকর বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করেন। পরিশেষে সর্বসম্মতিক্রমে সরকারীভাবে রাস্তা-ঘাটে হাটে-বাজারে, বিভিন্ন প্রকার যানবাহনে এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তথা বিভিন্ন সমাবেশে ও লোকালয়ে ধূমপান করা এবং ধূমপানের সামগ্রী অর্থাৎ বিড়ি সিগারেট ইত্যাদি বিক্রয় করা নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে ধূমপায়ীদের এবং বিড়ি সিগারেট বিক্রেতাদের শাস্তির জন্য জেল ও জরিমানার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিশেষে ধূমপানকারী ভাইদের নিকট আকুল আবেদন এই যে, আপনি একজন মুসলমান, যে কোন মুহূর্তে আপনার মৃত্যুঘন্টা বেজে উঠতে পারে, আর মৃত্যুর পরে আপনার সারাটি জীবনের সকল প্রকার কর্মকাণ্ডের হিসাব মহান আল্লাহর দরবারে দিতে হবে। আর আপনি যেহেতু পরিষ্কারভাবে জানতে পারলেন যে, ধূমপান ক্ষতিকর এবং হারাম, তাই আপনার কর্তব্য হলোঃ

১. আল্লাহর উদ্দেশ্যে ধূমপানকে ঘৃণা করা।

২. এটি বর্জনের দৃঢ় সংকল্প করা।

৩. সিগারেটের পরিবর্তে দাঁতন-মিসওয়াক অথবা অন্য কোন হালাল ও পবিত্র দ্রব্য ব্যবহার করা।

৪. ধূমপায়ীদের সমাবেশে না যাওয়া।

অতএব আপনি চিরতরে ধূমপান বর্জন করার জন্যে সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য চান, আর প্রার্থনা করুন– হে আল্লাহ্! ধূমপানের প্রতি আমাদের অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি করে দিন এবং এ থেকে বাঁচার তাওফিক দিন- আমীন।

৪৭.মদপান করা যদিও পরিমাণে এক ফোঁটা হোক না কেন

(شُرْبُ الْخَمْرِ وَلَوْ قَطْرَةً وَاحِدَةً)

বর্তমান বিশ্বে 'মদ' তথা নেশার দ্রব্যাদি আধুনিক সভ্যতার এক বড় ভয়ংকর অভিশাপ। চতুর্দিকে শুধু নিশা আর নিশা– অনেকেই বিড়ি-সিগারেট, হুক্কা ও গাঁজা টানার নিশায় মাতোয়ারা, অনেকেই পানের সাথে কাঁচা তামাক ও জর্দা খাওয়ায় মাশগুল, আবার অনেকেই গুল ব্যবহারে খুবই অভ্যস্ত আর অনেকেই তো মদ ও হিরোইন সময়মত খেতে না পারলে একেবারে যেন পাগল হয়ে যায়। এটাই হলো বর্তমান বিশ্বে নিশাদার ব্যক্তিদের বাস্তব অবস্থা। অথচ বিভিন্ন দেশে বহু আইন-কানুন করে এই নিশার বিরুদ্ধে যতই প্রচার চালানো হচ্ছে,ততই যেন এই বিভিন্ন ধরনের নিশার দ্রব্যাদি দুর্বার গতিতে বিশ্বের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। বর্তমান আধুনিক সভ্যতার যুগে এ সমস্ত নিশাদার বস্তু বিশেষ করে যুব সমাজের চরিত্র ধ্বংসকারী কামান হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে। অথচ ইসলামী শরী'আত বহু পূর্বেই শুধু 'মদ' পান করাকেই হারাম করেনি; বরং এই নিশাদার বস্তু সমূহের উৎপাদন ও বেচা-কেনা

পর্যন্ত হারাম করে দিয়েছে আর এ সমস্ত নিশাদার বস্তু খাওয়া এবং পানকারীদের জন্য দৈহিক শাস্তিও নির্ধারণ করে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বহুপূর্বে মানুষদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾ (المائدة: ٩٠)

অর্থঃ "হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি ও ভাগ্য নির্ধারণকারী তীর বা লটারী এ সবগুলিই অপবিত্র আর শয়তানী কাজ। সুতরাং তোমরা এগুলি থেকে বিরত থাক। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।" (আল-মায়েদা,৯০)

'মদ' পান করা হারাম আর এই 'মদ' হ'তে বিরত থাকার এটাই অন্যতম শক্তিশালী দলীল। আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে মদের সঙ্গে মূর্তির কথা উল্লেখ করেছেন। মূর্তি তো কাফের ও মুশরিকদের উপাস্য ও দেব-দেবীর নাম। 'মূর্তি পূজা' হারাম আর এদিকে 'মদ পান করা'ও হারাম। আর এই 'মদপান' সম্পর্কে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) উম্মাতে মুহাম্মাদীকে খুব কঠোরভাবে সতর্ক করে বলেছেন,

"إِنَّ عَلَى اللهِ عَهْدًا لِّمَنْ يَّشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يُّسْقِيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ, قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ وَمَا طِيْنَةُ الْخَبَالِ ؟ قَالَ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ" (مسلم ١٠٨٧/٣).

অর্থঃ "যে ব্যক্তি 'মদপান' করে তার জন্য আল্লাহর অঙ্গীকার হলোঃ, তিনি তাকে (ক্বিয়ামতের দিন) 'ত্বীনাতুল খাবাল' পান করাবেন। এ কথা শুনে ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) 'ত্বীনাতুল খাবাল' কী?

তখন উত্তরে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বললেন, জাহান্নামবাসীদের ঘাম অথবা পূঁজ ও রক্ত" (মুসলিম ৩/১৫৮৭)। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আরো বলেছেন,

"مَنْ مَّاتَ مُدْمِنُ خَمْرٍ لَقِيَ اللهَ وَ هُوَ كَعَابِدِ وَثَنٍ" (طبراني ٤٥/٢, صحيح الجامع رقم الحديث ٦٥٢٥).

অর্থঃ "যে ব্যক্তি শরাব পানকারী হিসাবে মারা যাবে, (ক্বিয়ামতের দিন) সে একজন মূর্তিপূজকের ন্যায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে" (ত্বাবারাণী ২/৪৫, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৬৫২৫)।

বর্তমান যুগে বিভিন্ন রকম 'মদ' আর বিভিন্ন রকম নেশাজাতীয় বস্তু বেরিয়েছে। তাদের আবার আরবী, আজমী বিভিন্ন প্রকারের নামও রয়েছে। যেমন- বিয়ার, হুইস্কি, নির্যাস, ভদকা, শ্যামপেন, কোডিন, মরফিন, প্যাথেডিন, হেরোইন, ড্রাগ ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِيْ الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا" (احمد ٣٤٢/٥, صحيح الجامع رقم الحديث ٥٤٥٣)

অর্থঃ "নিশ্চয়ই আমার উম্মাতের মধ্য হ'তে কিছু লোক 'মদ' পান করবে, আর তারা ঐ 'মদের' বিভিন্ন রকম নাম তৈরী করে নিবে" (আহমাদ ৫/৩৪২, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৫৪৫৩)। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর ভবিষ্যৎ বাণী অনুযায়ী মদের ঐ নির্ধারিত নাম 'মদ' পরিবর্তন করে মদপানকারী মুসলমানরাও বর্তমান যামানায় প্রকাশ পেয়েছে। আর তারা ঐ মদের নাম দিয়েছে–'রুহানী টনিক' বা 'সন্জীবনী সূধা'। অথচ এটা একেবারেই মিথ্যার উপরে মিথ্যা ও প্রতারণা

মাত্র। এই সমস্ত প্রতারণাকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿يُخَادِعُوْنَ اللهَ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ﴾ (البقرة:٩)

অর্থঃ "(ঐ সমস্ত মুনাফিকরা) তারা আল্লাহ ও ঈমানদারদের সাথে প্রতারণা করে, অথচ তারা যে নিজেদের সাথেই প্রতারণা করছে– তা তারা মোটেই বুঝতে পারছে না"(আল-বাক্বারাহ,৯)

'মদ' কি জিনিস? আর তার বিধান কী? ইসলামী শারী'আতে তার পরিপূর্ণ নীতিমালা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যাতে করে এ সম্পর্কে কোন ফিৎনা বা দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবকাশ না থাকে। এই নীতিমালা সম্পর্কে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" (مسلم ١٥٨٧/٣).

অর্থঃ "প্রত্যেক নেশার দ্রব্যই 'খামর' বা 'মদ' আর প্রত্যেক নেশার দ্রব্যই হারাম" (মুসলিম ৩/১৫৮৭)। অতএব যা কিছুই মানুষের মস্তিষ্কের সঙ্গে মিশে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিকে নেশাগ্রস্ত করে তোলে সেটাই হারাম। সেটা কম হৌক আর বেশী হৌক, তা তরল পদার্থ হৌক অথবা কঠিন কোন বস্তু হৌক না কেন। আর এ সব নেশাদার বস্তুর নাম যাই হৌক না কেন– মূলত এ সবই এক আর এ সবের বিধানও এক।

পরিশেষে মদপানকারীদের উদ্দেশ্যে নবী কারীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)এর একটি উপদেশবাণী তুলে ধরা হলো। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ. فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ. فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ. فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُسْقِيَهُ مِنْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ وَ مَا رَدْغَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ" (ابن ماجه رقم الحديث٣٣٧٧, صحيح الجامع رقم الحديث ٦٣١٣).

অর্থঃ "যে ব্যক্তি মদপান করে আর এ কারণে সে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে– তাহ'লে তার ৪০ দিনের ছালাত ক্বৃবূল হবে না। আর যদি সে ঐ অবস্থায় মারা যায়, তাহ'লে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর যদি সে তাওবা করে– তাহ'লে আল্লাহ তার তাওবাহ ক্বৃবূল করে নিবেন। পুনরায় যদি সে মদ পান করে ও নেশাগ্রস্ত হয়, তাহ'লে তার ৪০ দিনের নামায ক্বৃবূল হবে না। আর যদি সে ঐ অবস্থায় মারা যায়– তাহ'লে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর যদি সে তাওবা করে পুনরায় আল্লাহ তার তাওবা কবূল করে নিবেন। পুনরায় যদি সে মদ পান করে ও নেশাগ্রস্ত হয়, তাহ'লে তার ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। আর যদি সে ঐ অবস্থায় মারা যায়– তাহ'লে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর যদি সে তাওবা করে পুনরায় আল্লাহ তার তাওবা কবূল করে নিবেন। পুনরায় যদি সে মদ পান করে তবে তাকে ক্বিয়ামতের দিন 'রাদগাতুল খাবাল' পান করানো আল্লাহর জন্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) 'রাদগাতুল খাবাল' কী জিনিস? উত্তরে তিনি বললেন, "জাহান্নামীদের শরীর থেকে

নির্গত পুঁজ, রক্ত ও রস" (ইবনু মাজাহ হাদীছ নং ৩৩৭৭, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৬৩১৩)।

এই যদি হয় সাধারণ নেশায় অভ্যস্ত লোকদের পরিণতি, তাহ'লে ঐ সমস্ত লোকদের পরিণতি কেমন হবে, যারা গুরুতরভাবে নেশার দ্রব্যে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, আর বার বার তা পান করতে থাকে।

৪৮. সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহার করা আর তাতে পান করা

(اِسْتِعْمَالُ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِيْهِمَا)

আধুনিক যুগে গৃহে ব্যবহারিত জিনিস-পত্রের দোকানসমূহের মধ্য হতে এমন কোন দোকান পাওয়া যাবে না, যেখানে সোনা-রুপার পাত্র অথবা সোনা-রুপার প্রলেপযুক্ত পাত্রাদি নেই। অনেক ধনী লোকের ঘরে এমনকি অনেক হোটেলেও এধরণের পাত্রে খানা-পিনা পরিবেশন করা হয়। এছাড়া বর্তমানে হাদীয়া বা উপঢৌকন হিসাবে একে অপরকে সোনা-রুপার পাত্র দেওয়ার প্রচলন অনেক বেড়ে গেছে। কেউ কেউ নিজ বাড়ীতে সোনা-রুপার পাত্র রাখে না বটে কিন্তু অন্যের বাড়ীতে 'ওয়ালিমা' ইত্যাদি অনুষ্ঠানে পরিবেশিত সোনা-রুপার পাত্র ব্যবহারে কোন রকম প্রতিবাদ করে না। অথচ নিজ বাড়ীতে হৌক আর অন্যের বাড়ীতে হৌক ইসলামী শরী'য়াতে এসব পাত্র ব্যবহার করা হারাম করা হয়েছে। এধরনের সোনা-রুপার পাত্র ব্যবহার করার জন্য হাদীছে কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) উম্মু-সালামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে বলেছেন,

"إِنَّ الَّذِيْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِيْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارُ جَهَنَّمَ" (مسلم ٣/١٦٣٤).

অর্থঃ "যে ব্যক্তি রূপা ও সোণার পাত্রে খাবে কিংবা পান করবে তার পেটে জাহান্নামের আগুন ঢক ঢক করে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে"(মুসলিম ৩/১৬৩৪)। এ বিধান খাবারের পাত্র সহ যে কোন ধরনের সোনা-রুপার পাত্রের জন্য গণ্য হবে। যেমন- প্লেট, ডিস, কাঁটা চামচ, চামচ, ছুরি, মেহমানদারীর জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা খাদ্যদ্রব্য দেওয়ার জন্য বড় পাত্র। বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে মিষ্টি অথবা এ জাতীয় অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য পরিবেশনের ডালা বা বিশেষ ধরনের বড় পাত্র। আবার কিছু লোক শো-কেসের মধ্যে সোনা-রুপার পাত্র রেখে বলে, এগুলি আমরা ব্যবহার করি না, কেবল সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য রেখে দিয়েছি। হারামের পথ বন্ধ করার জন্য তাদের উক্ত কাজ ও যুক্তি মোটেই গ্রহণ যোগ্য নয়।

৪৯. মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া (شَهَادَةُ الزُّوْرِ)

মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿فَاجْتَنِبُوْا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ- حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ﴾ (الحج: ٣٠-٣١)

অর্থঃ "সুতরাং তোমরা মূর্তি বা প্রতিমা পূজার অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক আর মিথ্যা কথা বলা থেকে দূরে থাক, আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং তাঁর সাথে শিরক না করে" (হাজ্জ,৩০-৩১)। মিথ্যা কথা বলার ভয়াবহতা সম্পর্কে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

"عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ (ثَلَاثًا) اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَ عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا. فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ فَمَازَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ" (بخارى, فتح الباري ٥/٢٦١).

অর্থঃ "আব্দুর রাহমান বিন আবূ-বাকরা (রাঃ) বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর মজলিসে ছিলাম। এমন সময় তিনি আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন,"আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কাবীরা গোনাহ সম্পর্কে খবর দিব না"? এ কথাটি রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) ৩ বার বলেছিলেন। উত্তরে ছাহাবারা (রাঃ) বলেছিলেন, হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আপনি আমাদেরকে খবর দিন। তখন রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বললেন, আল্লাহর সাথে শিরক করা, পিতা-মাতার আদেশ অমান্য করা। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) হেলান দেওয়া অবস্থায় কথাগুলি বললেন। অতঃপর তিনি সোজা হয়ে বসে বললেন, শুনে রাখ! আর মিথ্যা কথা বলা। এ কথাটা তিনি বার বার বলছিলেন। শেষ পর্যন্ত আমরা বলতে শুরু করেছিলাম, হায়! তিনি যদি চুপ করতেন" (বুখারী, ফাতহুল বারী ৫/২৬১)।

আলোচ্য হাদীছে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার ভয়াবহতা বুঝানোর জন্য ঐ কথাটি বার বার বলা হয়েছিল। কেননা অনেক মানুষ এ বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দেয় না। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার পিছনে অনেক কারণও রয়েছে। যেমনঃ একে অপরের সাথে শত্রুতা, হিংসা ইত্যাদি। আর মিথ্যা সাক্ষীর ফলে ক্ষয়-ক্ষতিও হয় প্রচুর।

এভাবে মিথ্যা সাক্ষীর ফলে কত মানুষের হক্ব যে নষ্ট হচ্ছে , কত নির্দোষ লোক যুলুম ও নিপীড়নের শিকার হচ্ছে, কত লোক যে জিনিসের উপর তাদের কোন অধিকার নেই– অথচ তারা সে জিনিসের ভিতর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নিচ্ছে, আর কতজন যে বংশের মানুষ নয়– অথচ সে, সে বংশের সন্তান হিসাবে গণ্য হচ্ছে, মোটকথা এই মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার ফলে বর্তমান সমাজে এ ধরনের কত যে যুলুম,নির্যাতন ও অবিচার চলছে তার কোন হিসাব নেই। কিছু লোক বিচার ও ফায়ছালার ক্ষেত্রে অন্য লোককে এই বলে নিজের পক্ষে টেনে আনে যে, তুমি আমার পক্ষে অমুক বিষয়ে আদালতে এভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে, তোমার প্রয়োজনে আমিও তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দিব। একথা সকলেরই জানা প্রয়োজন যে, কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে হ'লে সেই বিষয় সম্পর্কে পূরাপুরি জানা একান্ত কর্তব্য। অথচ হয়ত এই লোকটির সঙ্গে তার কোর্টের বারান্দায় কিংবা বাড়ীর দহলিজে মাত্র একবার দেখা হয়েছে–মূল ঘটনার সময় হয়ত সে আদৌ উপস্থিত ছিল না। তা সত্ত্বেও সে দুনিয়াবী কোন স্বার্থের খাতিরে অমনি কোর্টে যেয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে দিল। তার এই মিথ্যা সাক্ষ্যের ফলে হয়ত কোন জমি কিংবা কোন বাড়ীর মালিকানা প্রকৃত মালিকের হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে। কিংবা কোন দোষী ব্যক্তি বেকসুর খালাছ পেয়ে যেতে পারে। এ সব সাক্ষ্য ডাহা মিথ্যা। সুতরাং নির্ধারিত বিষয়ে কোন কিছু না দেখে না জেনে কোন প্রকারেই সাক্ষ্য দেওয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا﴾ (يوسف: ٨١). অর্থঃ "আমরা যা কিছু জানি শুধু সেই বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারি না" (ইউসুফ,৮১)।

৫০. গান-বাজনা শ্রবণ করা

(سِمَاعُ الْمَعَازِفِ وَالْمُوْسِيْقِيْ)

[বর্তমান যুগে গান-বাজনার সাথে পরিচিত নয় এমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম পাওয়া যাবে। গানের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। কিন্তু কম্বলের লোম বাছা যেমন কষ্টকর– তেমনি অসংখ্য হারাম গানের মধ্য হ'তে দু'একটি হালাল গান খুঁজে বের করাও খুবই কষ্টকর ব্যাপার। গান দ্বারা যদি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রশংসা করা উদ্দেশ্য হয়, জিহাদের প্রতি অনুপ্রাণিত করা হয়, ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে উৎসাহিত করা হয়, চরিত্র গঠনের চেষ্টা করা হয়, জনগণকে পাপ-পংকিলতা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হয়– তাহ'লে এ সমস্ত গান গাওয়া বা শুনা ইসলামী শরী'আতে জায়েয হবে দু'টি শর্ত সহকারে। শর্ত দু'টি হলো,

১. ঐ গান বাদ্যযন্ত্র ছাড়া হতে হবে।

২. আর নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ ছাড়া হতে হবে।

(নববী, শরহে ছহীহ মুসলিম, তানজীমুল আশতাত, ঈদ অধ্যায়- অনুবাদক]

অতএব ইসলামী শরী'আতে গান গাওয়া ও গান শোনা উভয়ই হারাম তথা নিষিদ্ধ। কেননা এর দ্বারা মানুষের অন্তর কঠিন ও ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে যায়। এ ব্যাপারে উলামাগণ তাদের মতামত ব্যক্ত করে বলেছেন যে, সর্বসম্মতিক্রমে গান গাওয়া ও গান শোনা হারাম তথা নিষিদ্ধ। গান হারাম হওয়ার স্বপক্ষে

উলামাগণ যে সমস্ত দলীল ও প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

প্রথম দলীলঃ কুরআন মাজীদ হ'তে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ – وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (لقمان:٦–٧)

অর্থঃ "মানুষের মধ্য হ'তে এমন অনেকেই আছে যারা মন ভুলানো কথা খরিদ করে

আনে, যাতে করে তারা লোকদেরকে সঠিক জ্ঞান ব্যতিরেকেই আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করে দিতে পারে আর তারা ঐ পথটিকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে পারে, আর এদের জন্যেই রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। আর যখন তাদের সামনে আমার আয়াত সমূহ পাঠ করা হয়, তখন ওরা দম্ভের সাথে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়– যেন ওরা শুনতেই পায়নি, যেন ওদের দু'কান বধির। অতএব (হে মুহাম্মাদ! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আপনি ওদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন" (সূরা লুকমান, ৬-৭)।

আল-ওয়াহেদী ও অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেছেন, উপরোক্ত আয়াতে যে 'লাহওয়াল হাদীছ' শব্দটি এসেছে তার অর্থ হচ্ছে, গান-বাজনা। ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, মুজাহিদ ও ইকরেমা (রাযিআল্লা-হু আনহুম) উল্লিখিত আয়াতে 'লাহওয়াল হাদীছ' শব্দটিকে গান-বাজনার অর্থে গ্রহণ করেছেন।

আর এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন,

"وَاللهِ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ هُوَ الْغِنَاءُ يَعْنِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ"

অর্থঃ "ঐ মহান আল্লাহর শপথ করে বলছি, যিনি ব্যতীত সত্যিকার কোন ইলাহ অর্থাৎ উপাস্য নেই, গান-বাজনাই হচ্ছে 'লাহওয়াল হাদীছ'।

দ্বিতীয় দলীল হাদীছ থেকেঃ রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحُـرَّ وَ الْحَرِيْـرَ وَ الْخَمْـرَ وَ الْمَعَازِفَ" (بخاري).

অর্থঃ "আমার উম্মাতের মাঝে কতকগুলি সম্প্রদায় এমন হবে– যারা ব্যভিচার করা, রেশমের কাপড় পরা, মদ পান করা এবং গান-বাজনা করা হালাল মনে করবে" (বুখারী)। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম) আরো বলেছেন,

"يُمْسَخُ الْقَوْمُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ. وَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ أَلَيْسُوْا يَشْهَدُوْنَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُـوْلُ اللهِ ؟ قَالَ: بَلَى وَيَصُوْمُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ وَيَحُجُّوْنَ قِيْلَ فَمَا بَالُهُمْ ؟ قَالَ: اتَّخَـذُوْا الْمَعَازِفَ وَالدُّفُوْفَ وَالْقَيْنَاتَ فَبَاتُوْا عَلَى شُرْبِهِمْ وَلَهْوِهِمْ فَأَصْبَحُوْا وَقَـدْ مُسِخُوْا قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ" (إغاثة اللهفان , ٢٦٢/١).

অর্থঃ "এ উম্মাতের মধ্য হ'তে কতকগুলি কওম অর্থাৎ সম্প্রদায়কে শেষ যামানায় বানর ও শূকরের আকৃতিতে পরিবর্তন করে দেওয়া হবে। এটা শুনে উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) কেন এমন হবে? তারা কি এই সাক্ষ্য দেয়নি যে, 'একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার আর কোন ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ

(ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল'? তখন রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ, শুধু তাই নয়; তারা রোযাও রাখবে, নামাযও পড়বে, এবং হজ্জও করবে। তখন ছাহাবীরা বললেন, তাহ'লে তাদের এ দূরবস্থা কেন? উত্তরে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বললেন, তারা গান-বাজনা, ঢাক-ঢোল ও গায়িকাদেরকে সাদরে গ্রহণ করেছে, আর তাদের সাথে মদ পান ও খেল তামাশায় রাত কাটিয়েছে। ফলে তারা বানর এবং শূকরের আকৃতিতে পরিণত হয়ে গেছে"(এগাছাতুল লাহফান, ১/২৬২)। অন্য হাদীছে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) ঢোল-তবলা বাজাতে নিষেধ করেছেন, আর বাঁশিকে দুষ্ট লোক ও বোকার কণ্ঠস্বর নামে আখ্যায়িত করেছেন। পূর্বসূরি আলেমগণের মধ্য হ'তে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রাহিঃ) সহ আরো অনেকেই পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে, অহেতুক খেলা-ধূলা, কৌতুক, গান-বাজনা আর এ সমস্ত খেলা-ধূলা ও গানে ঢোল-ঢাক ও বাদ্যযন্ত্র বাজানো সবই হারাম। যেমন- সারেঙ্গী, তানপুরা, রাবার, মন্দিরা, বাঁশি, ফ্লুট বাঁশি, তবলা ইত্যাদি।

আধুনিক বাদ্যযন্ত্রসমূহ নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর নিষিদ্ধ বাণীর আওতায় পড়ে। যেমন– দোতারা, পিয়ানো, গিটার, ম্যান্ডেলিন ইত্যাদি। এই যন্ত্রগুলি বরং হাদীছে নিষিদ্ধ তৎকালীন অনেক যন্ত্র থেকে অনেক বেশী মোহ ও তনময়তা সৃষ্টি করে। এমনকি বলা যেতে পারে বাদ্যযন্ত্রের নেশা মদের নেশা থেকেও বড় ভয়ংকর। আর যদি বাদ্যযন্ত্রের সাথে গান ও সুর মিলিত হয়– তাহ'লে পাপের পরিমাণ বেড়ে যাবে, তখন এটা বড় ধরনের হারাম হিসাবে গণ্য হবে। সেই সাথে গানের কথাগুলি যদি প্রেম-ভালবাসা, রূপচর্চা, যৌন উদ্দীপনা

সৃষ্টিকারী ইত্যাদি বিষয়ে হয় তাহ'লে তো বড় ধরনের পাপ হবে আর তার শাস্তিও বড় কঠিন হবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

আর এ কারণেই আলেমগণ বলেছেন, গান শয়তানের বাঁশি, গান যিনা-ব্যভিচারের পোষ্ট মাষ্টার-পিয়ন অর্থাৎ বার্তাবাহক আর অন্তরকে ব্যধিগ্রস্ত ও কঠিন করে দেওয়ার বড় হাতিয়ার। মোটকথা বর্তমান কালে গানের কথা, সুর ও বাদ্য এক বড় ফিৎনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিউজিকের এই সর্বগ্রাসী থাবা এখন শুধু গানেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং এই মিউজিক ঘড়িতে, বেলে, ভেঁপুতে, শিশুখেলনার ভিতরে, কম্পিউটারে এছাড়া কোন কোন টেলিফোনের মাঝেও ছড়িয়ে পড়েছে। একমাত্র আল্লাহর খাছ রহমত আর এ সমস্ত হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য মনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বা সংকল্প না থাকলে এসব অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকা বড় কঠিন ব্যাপার। "وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ" অর্থঃ "একমাত্র আল্লাহই সাহায্যস্থল"।

প্রশ্নঃ

১. গান-বাজনা সম্পর্কে ইসলামী শরী'আতের বিধান কী? গান কি হারাম, না হারাম নয়?

২. আমি তো শুধু চিত্তবিনোদনের জন্যে গান শুনে থাকি, এ ব্যাপারে ইসলামী বিধান কী?

৩. গানসমূহে বাদ্যযন্ত্র ও হারমোনিয়াম ব্যবহার সম্পর্কে ইসলামী শরী'আতের বিধান কী?

উত্তরঃ

১–২–৩ ইসলামী শরী'আতে গান গাওয়া আর গান শোনা উভয়ই হারাম তথা নিষিদ্ধ। কেননা গানের কারণে মানুষের অন্তর বা হৃদয় ব্যাধিগ্রস্ত ও শক্ত হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, তা আল্লাহ

তা'আলার স্মরণ ও নামায থেকে মানুষকে বিরত রাখে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (لقمان:٦)

অর্থাঃ "মানুষের মধ্য হ'তে এমনও কেউ কেউ আছে, যারা মন ভুলানো কথা খরিদ করে আনে" (সূরা লুকমান,৬)। অধিকাংশ তাফসীরকারকগণ উক্ত আয়াতে যে 'লাহওয়াল হাদীছ' শব্দটি এসেছে, তার অর্থ গান-বাজনা করেছেন। আর আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) আল্লাহর নামে শপথ করে বলেছেন যে, 'লাহওয়াল হাদীছ' এর অর্থ হলোঃ গান-বাজনা। আর যখন গানের সাথে বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়, যেমন হারমোনিয়াম, একতারা, তবলা, বেহালা, বাঁশি ইত্যাদি তখন ইসলামী শরী'আত ঐ মিশ্রিত গান ও বাজনাকে কঠোরভাবে হারাম তথা নিষেধ করেছে। অতএব তা চিরতরে পরিহার করা ওয়াজিব তথা আবশ্যক।

পরিশেষে আমি আপনাকে এবং অন্যান্যদেরকে এমর্মে উপদেশ দিচ্ছি যে, চিত্ত বিনোদনের জন্যে গান শোনার পরিবর্তে আপনারা রেডিওতে 'কুরআনুল কারীম' এবং 'আলোর দিশারী' নামক অনুষ্ঠান দু'টি শুনতে পারেন। এছাড়া কোন বিদ'আতী আলেমের নয় বরং তাওহীদপন্থী অর্থাৎ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে যে সমস্ত আলেম বক্তব্য রাখেন তাঁদের বক্তব্যের ক্যাসেটসমূহ শুনতে পারেন।

প্রশ্নঃ-৪. বিবাহ অনুষ্ঠানে ঢোল-বাদ্য বাজানো কি হারাম? আমি তো শুনেছি হালাল, কিন্তু আমি সঠিকভাবে তার শারঈ

বিধান জানিনা। অতএব এ ব্যাপারে ইসলামের বিধান কী? তা জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তরঃ বিবাহ অনুষ্ঠানে ঢোল-বাদ্য বাজানোর বিষয়ে ইসলামী শরী'আতের বিধান হলোঃ বিবাহ অনুষ্ঠানের শুরু-লগ্নে দফ অর্থাৎ একমুখো ঢোল বাজিয়ে গান পরিবেশন করা জায়েয। এই শর্তে যা মানুষকে হারামের দিকে ধাবিত করেনা। এটা বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য জায়েয। তাও শুধুমাত্র বিবাহের প্রচারের জন্য, কেননা বিবাহ ও ব্যভিচারের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে এটাই-যা ছহীহ সূত্রে নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর হাদীছ হ'তে প্রমাণিত। অর্থাৎ বিবাহ ও ব্যভিচারের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী হলো দফ বাজানো আর বিয়ের প্রচার করা। তবে বিবাহ অনুষ্ঠানে ঢোল-বাদ্য, তবলা ইত্যাদি বাজানো জায়েয নেই, বরং শুধুমাত্র দফ (একমুখো ঢোল) বাজানোই যথেষ্ট। আর বিবাহের প্রচারের জন্য মাইক বাজানোও না জায়েয। যা মানুষদেরকে বড় ধরনের ফিৎনার দিকে আহবান জানায়, যার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আর যা মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়- এমন ধরনের গান পরিবেশন করাও নাজায়েয। বিবাহ অনুষ্ঠানে দীর্ঘ সময় ব্যয় করাও নাজায়েয। যত কম সময়ে বিবাহের প্রচারকাজ সম্ভব, ততটা সময়ই যথেষ্ট। কেননা দীর্ঘ সময় বিবাহ অনুষ্ঠানে ব্যয় করার কারণে বহু মানুষ ঠিক সময়ে ঘুমাতে পারে না। আর অসময়ে ঘুমানোর কারণে বহু মানুষ ফজরের সময় ঘুমে অচেতন থাকে। যার ফলে অধিকাংশ মানুষের ফজরের নামায ছুটে যায়, নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করতে পারে না। আর ইসলামী শরী'আতে এ ধরনের কাজ হচ্ছে হারাম- কেননা এ ধরনের কাজ হচ্ছে মুনাফিকদের কাজ।

৫০/২ আল্লাহর তরফ থেকে আযাব ও গযব নাযিল হওয়ার বা ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ১৫টি ছোট আলামত

(خَمْسَةُ عَشَرْ عَلاَمَاتُ الصُّغْرٰى لِلْقِيَامَةِ)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا فَعَلَتْ أُمَّتِيْ خَمْسَ عَشَرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلاَءُ , فَقِيْلَ: وَمَا هُنَّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَغْنَمُ دُوَلاً, وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا, وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا, وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَ عَقَّ أُمَّهُ, وَ بَرَّ صَدِيْقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ, وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ فِيْ الْمَسَاجِدِ , وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ , وَ أُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ, وَ شُرِبَتِ الْخُمُوْرُ , وَ لُبِسَ الْحَرِيْرُ , وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَ الْمَعَازِفُ, وَ لَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَوَّلَهَا, فَلْيَرْتَقِبُوْا عِنْدَ ذَلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا وَ مَسْخًا" (رواه الترمذى)

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ– হযরত আলী ইবনি আবী ত্বা-লিব (রাঃ) হ'তে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, জনাব রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেন, যখন আমার উম্মাতেরা সচরাচর ১৫টি কাজে লিপ্ত হবে; তখন তাদের উপর বালা-মছিবত অর্থাৎ আসমান ও যমীন থেকে আল্লাহর আযাব ও গযব নাযিল হতে থাকবে। অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, 'মোতি গাঁথা মালার' সূতা কেটে দিলে মোতিগুলি যেমন একের পর এক নিচে পড়তেই থাকে– ঠিক উক্ত ১৫টি কাজে উম্মাতে মুহাম্মাদী ব্যাপকভাবে

লিপ্ত হওয়ার কারণে তাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব ও গযব একটার পর একটা নাঝেল হতেই থাকবে)। তখন ছাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) সে ১৫টি কাজ কী কী ? উত্তরে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) ধারাবাহিক ভাবে যে ১৫টি কাজের বর্ণনা দিয়ে ছিলেন তা নিম্নরূপ।

১. যখন মানুষেরা গানীমতের মাল অর্থাৎ সরকারী মাল ব্যাপকহারে আত্মসাত করবে।

২. আমানতের খিয়ানত করবে।

৩. নিজের ধন-সম্পদ থেকে যথাযথভাবে হিসাব-নিকাশ করে যাকাত আদায় করাকে; কোন বিষয়ে জরিমানা দেয়ার মত কষ্টকর মনে করবে।

৫. পুরুষেরা যখন তাদের মায়ের সাথে অবাধ্য আচরণ করবে।

৪.আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে তারা তাদের স্ত্রীদের কথা ও কাজের অনুসরণ করবে।

৭. যখন মানুষেরা তাদের পিতা বা পিতা-মাতা উভয়ের সাথে শত্রুতা পোষন বা অসদ্ব্যবহার করবে।

৬. আর বন্ধুদের সাথে অর্থাৎ নতুন নতুন বন্ধু ও আত্মীয় বানিয়ে নিয়ে তাদের সাথে খুবই

আন্তরীকতা সৃষ্টি করে খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরায় মেতে উঠবে।

৮. যখন মানুষেরা দুনিয়াবী বিষয় -যেমন বেচা-কেনা, দেনা-পাওনা, নেতৃত্ব ইত্যাদি নিয়ে

মাসজিদসমূহে জোরে জোরে কথা-বার্তা বলে মাসজিদের আদবের খেলাফ করবে।

৯. যখন বংশের বা গোত্রের মধ্য থেকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোকেরাই বংশের ও গোত্রের নেতা বা সর্দার হবে।

১০. যখন দুসকৃতিকারীদের দুস্কর্মের ভয়ে সাধারণ মানুষেরা তাদেরকে সম্মান করবে।

১১. যখন বহু সংখ্যক মানুষেরা নেশাদার বস্তু যেমন মদ, তাড়ি, গাঁজা, হিরোইন ইত্যাদি ব্যাপকহারে পান করবে।

১২. বিশেষ করে পুরুষেরা যখন রেশমী কাপড় পরিধান করবে।

১৩.১৪) যখন মানুষেরা ব্যাপকহারে বাদ্যযন্ত্র, গায়িকা ও নর্তকীদেরকে ব্যবহার করবে, অর্থাৎ গান-বাজনায় সব মাশগুল হয়ে পড়বে। (মোবাইলের আপত্তিকর বাজনাও হারামের ভিতর গণ্য হবে)।

১৫. যখন এই উম্মাতের শেষ যামানার মানুষেরা পূর্ব যামানার লোকদেরকে অন্যায়ভাবে দোষারোপ করবে। উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার মধ্য হ'তে যখন উল্লিখিত ১৫টি কাজ ব্যাপকভাবে সংঘটিত হবে– তখন তারা যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে আসমানী আযাব-গযব ও যমীনের বিপদ-আপদ ভোগ করার জন্য অপেক্ষা করে বা প্রস্তুত থাকে। আর সেই আল্লাহ প্রদত্ত বিপদ-আপদ, আযাব-গযব গুলো হলোঃ লালবায়ু অর্থাৎ ঘূর্ণীঝড় টর্নেডো, ভূমিকম্প, পানিকম্প, ভূমি ধসে যাওয়া, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মহামারী, মানুষের আকৃতি পরিবর্তন হওয়া ইত্যাদি (তিরমিযী)। উল্লিখিত পাপকাজগুলি এবং সকল প্রকার আযাব ও গযব হ'তে

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে বিরত ও নিরাপদে থাকার পূর্ণ তাওফীক দান করুন, আমীন।

৫১. গীবত ও গীবতকারীর পরিণতি

(اَلْغِيْبَةُ وَ نَتِيْجَةُ صَاحِبِ الْغِيْبَةِ)

ইসলামী শরী'আত মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রতি খুবই গুরুত্ব দিয়েছে। আর সেই সাথে সাথে ইসলামী শরী'আত ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব নষ্টকারী সকল কর্ম হ'তে বিরত থাকতে সকলকে জোর তাকীদ দিয়েছে। সমাজে যে সব বিষয়ে ফাটল ধরাতে আর ঐক্যের সিসাঢালা প্রাসাদকে ভেঙ্গে তছনছ করে দিতে পারে এমন বিষয়গুলির অন্যতম হলো 'গীবত' বা 'পরনিন্দা'। আর এই গীবতের মাধ্যমেই শয়তান মানব সমাজে ফাটল ধরিয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾

অর্থঃ "পিছনে ও সামনে পরনিন্দাকারীদের জন্য দুর্ভোগ" (হুমাযাহ,১)। পবিত্র কুরআন ও হাদীছে এই ঘৃণিত আচরণ সম্পর্কে মানুষদেরকে বিভিন্নভাবে সতর্ক করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে গীবতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলো।

'গীবত' এর সংজ্ঞাঃ 'গীবত' অর্থ বিনা প্রয়োজনে কোন ব্যক্তির দোষ অপরের নিকট বর্ণনা করা। ইবনুল আছীর বলেন, 'গীবত' হলোঃ মানুষের এমন কিছু বিষয় তার অনুপস্থিতিতে উল্লেখ করা, যা সে অপসন্দ করে, যদিও ঐ দোষ তার মধ্যে মওজুদ থাকে। এসব সংজ্ঞা মূলত হাদীছ হ'তে নেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) গীবতের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, "গীবত হলো তোমার ভাইয়ের এমন আচরণ

বর্ণনা করা, যা সে পসন্দ করে না"। (মুসলিম হাদীছ নং ১৮০৩)।

গীবত করার পরিণামঃ গীবত করা কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। আর গীবতের পাপ সূদের পাপের চেয়েও বড় পাপ; সেহেতু হাদীছে গীবতকে বড় সূদ বলা হয়েছে। (ছহীহ আত-তারগীব)। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর নিকটে আয়েশা (রাঃ) ছাফিইয়াহ (রাঃ) এর সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আপনার জন্য ছাফিইয়ার এরকম এরকম হওয়াই যথেষ্ট। এর দ্বারা আয়েশা (রাঃ) ছাফিইয়ার বেঁটে সাইজ বুঝাতে চেয়েছিলেন। আয়েশা (রাঃ) এর এমন কথা শুনে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছিলেন, হে আয়েশা! তুমি এমন কথা বলেছ, যদি ঐ কথা সাগরের পানির সাথে মিশানো হ'ত- তাহ'লে ঐ কথা সাগরের পানির রঙকে বদলে দিত"(আবূদাউদ,তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৫১৪০)।

গীবত জাহান্নামের শাস্তি ভোগের অন্যতম কারণ হবেঃ

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন, মি'রাজের রাত্রিতে আমি এমন কিছু মানুষের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেছিলাম, যাদের নখগুলি ছিল সব পিতল দিয়ে তৈরী করা। তারা তাদের ঐ নখ দিয়ে তাদের মুখমণ্ডল ও বক্ষগুলিকে ছিঁড়তেছিল। আমি জিবরীল (আঃ) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, এরা কারা? জিবরীল (আঃ) উত্তরে বলেছিলেন, "এরা তারাই যারা মানুষের গোশত খেত আর মানুষের ইয্যত-আবরূ ও মান-সম্মান নষ্ট করত" (আবূদাউদ, মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ ছহীহ)।

গীবত করা মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমানঃ

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ (الحجرات:١٢)

অর্থঃ "তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে, কেননা তোমাদের কেউ কি চায় যে, সে তার মৃত ভাইয়ের গোশত (দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে) খাবে? (প্রকৃত পক্ষে) তোমরা তো এটাকে ঘৃণাই করে থাক"(আল-হুজুরাত,১২)। অত্র আয়াতে প্রমাণিত হলো যে, গীবত করা মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমান।

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, আরবরা সফরে বের হলে একজন আর একজনের খেদমত করত। আবূবাকর (রাঃ) ও উমার (রাঃ) এর সাথে একজন খাদেম ছিল। (একবার সফর অবস্থায়) ঘুম থেকে তাঁরা উভয়ে জেগে উঠে দেখলেন যে, তাঁদের খাদেম তাঁদের জন্য খানা তৈরী করেনি। তখন তাঁরা একে অপরকে বলতে লাগলেন, দেখ এই লোকটি বাড়ীতে ঘুমের ন্যায় ঘুমাচ্ছে। (অর্থাৎ এমনভাবে ঘুমে বিভোর যে, মনে হচ্ছে সে বাড়ীতেই রয়েছে, সফরে নয়)। অতঃপর তাঁরা তাকে জাগিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর কাছে যাও এবং বলো আবূবাকর (রাঃ) ও উমার (রাঃ) আপনাকে সালাম দিয়েছেন আর তরকারী চেয়ে পাঠিয়েছেন (নাস্তা খাওয়ার জন্য)। লোকটি রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর নিকট গেলে তিনি তাকে বললেন, তারা তো তরকারী খেয়েছে। তখন তাঁরা হতভম্ব হয়ে গেলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে নবী কারীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর

নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আমরা আপনার নিকটে লোক পাঠালাম তরকারী তলব করে, অথচ আপনি বলেছেন, আমরা তরকারী খেয়েছি? তখন নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের (অর্থাৎ খাদেমের) গোশত খেয়েছ। কসম ঐ সত্তার, যাঁর হাতে আমার জীবন, নিশ্চয়ই আমি ঐ খাদেমটির গোশত তোমাদের সামনের দাঁতের ফাঁকে দেখতে পাচ্ছি। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আপনি আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। উত্তরে রাসূল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বললেন, বরং ঐ খাদেমই তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুক" (যিয়া মাক্বদেসী, আল-আহাদীছুল মুখতারাহ)। আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন (আমসিক আলায়কা লিসানাকা, কুয়েতঃ ১ম সংস্করণ ১৯৯৭ইং, পৃঃ ৪৩)।

উল্লিখিত বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন,

"قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَجُلٌ (أَىْ غَابَ عَنِ الْمَجْلِسِ) فَوَقَعَ فِيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِهَذَا الرَّجُلِ : تُخَلَّلْ, فَقَالَ وَمِمَّ أَتَخَلَّلُ وَمَا أَكَلْتُ لَحْمًا قَالَ إِنَّكَ أَكَلْتَ لَحْمَ أَخِيْكَ" (طبراني, ابن أبي شيبه , حديث صحيح غاية المرام رقم الحديث ٤٢٨).

অর্থঃ "একদিন আমরা নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর নিকটে ছিলাম। এমতাবস্থায় আমাদের মধ্য হ'তে একজন লোক উঠে চলে গেলেন। লোকটি চলে যাওয়ার পর অপর একজন লোক তার ব্যাপারে সমালোচনা করল। তখন রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) ঐ

সমালোচনাকারীকে বললেন, তোমার দাঁত খিলাল কর। তখন লোকটি বলল, কী কারণে দাঁত খিলাল করব? আমিতো কোন গোশত খাইনি। তখন রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) তাকে বললেন, "নিশ্চয়ই তুমি তোমার ভাইয়ের গোশত খেয়েছ" অর্থাৎ গীবত করেছ (ত্বাবারাণী, ইবনু আবী শায়বা, হাদীছ ছহীহ দ্রঃ গায়াতুল মারাম হাদীছ নং ৪২৮)।

গীবত করা ক্ববরে শাস্তি ভোগের অন্যতম কারণঃ

একদা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম) দু'টি ক্ববরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন এবং বললেন, এই দুই ক্ববরবাসীকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তবে তাদেরকে তেমন কোন বড় পাপের কারণে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না (যা পালন করা তাদের পক্ষে কষ্টকর ছিল)। এদের একজনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, চুগোলখোরী করার কারণে আর অন্য জনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, পেশাবের ব্যাপারে অসতর্ক থাকার কারণে" (বুখারী, মুসলিম, ছহীহ আত-তারগীব হাদীছ নং ১৫৭)। অপর হাদীছে 'চুগোলখোরী' এর পরিবর্তে 'গীবত' করার কথা উল্লেখ রয়েছে (আহমাদ ও অন্যান্য, ছহীহ আত-তারগীব হাদীছ নং১৬০)।

গীবত করার প্রতি উদ্বুদ্ধকারী বিষয়সমূহঃ

১. রাগ ও ক্রোধঃ রাগ ও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে অনেকে গীবত করে থাকে। অথচ রাগ দমন করা একটি মহৎ গুণ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ﴾ (آل عمران : ١٣٤)

অর্থঃ "যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় দান করে থাকে, ক্রোধকে সংবরণ করে থাকে আর মানুষের অপরাধকে মার্জনা করে থাকে, মহান আল্লাহ এই জাতীয় সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন" (আলে-ইমরান,১৩৪)। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি (কোন বিষয়ে রাগ হ'লে) তার রাগকে দমন করে নিবে অথচ সে ঐ বিষয়ে তার রাগকে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম, একারণে আল্লাহ তা'আলা পরকালে তাকে সমস্ত সৃষ্টিকুলের সামনে ডেকে "হুরদের ব্যাপারে তাকে স্বাধীনতা দিবেন। সে যত সংখ্যক হুর চাইবে আল্লাহ তা'আলা তাকে তাদের সাথে বিয়ে দিয়ে দিবেন"(সুনান চতুষ্টয়, মুসনাদে আহমাদ, ত্বাবারাণী, ছাগীর, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৬৫২২)।

২. নিজেকে বড় মনে করা আর অপরকে ছোট মনে করাঃ

এই অসৎ উদ্দেশ্যের কারণে বহু মানুষ একে অপরের গীবত করে থাকে। অথচ এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,"কোন মানুষের অমঙ্গলের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে নিজ মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ মনে করবে"(মুসলিম)।

৩. খেলাধুলা ও হাসিঠাট্টা করাঃ অর্থাৎ খেল-তামাসা ও ঠাট্টা-মশকারা করতে গিয়ে বিনা প্রয়োজনে অনেক সময় মানুষ অন্য লোকের দোষ বর্ণনা করতে থাকে। আবার অনেকে এই সমালোচনা দ্বারা নিজের জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করে থাকে। নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম) এই ধরণের লোকদের সম্পর্কে বলেছেন,

"وَيْلٌ لِلَّذِىْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْـــلٌ لَـــهُ"

(أحمد,أبوداد, ترمذى, حاكم, صحيح الجامع رقم الحديث ٧١٣٦).

অর্থঃ "দুর্ভোগ ঐ ব্যক্তির জন্য, যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কথা বলে। দুর্ভোগ তার, দুর্ভোগ তার"(আহমাদ, আবূদাঊদ, তিরমিযী, হাকেম, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৭১৩৬)।

৪. একে অপরের কথায় মিল দিয়ে চলাঃ বন্ধু-বান্ধবের সাথে মিল দিয়ে চলা এবং তাদের কথার কোন প্রতিবাদ না করে বাহ্যিকভাবে তা সমর্থন করা। কারণ প্রতিবাদ করলে তাকে তারা বিদ্রোহী মনে করবে ও খারাপ ভাববে। এই প্রকৃতির লোকদের রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিম্নের বাণী স্মরণ রাখা উচিত।

مَنْ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَاالنَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَّلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ" (صحيح الجامع رقم الحـــديث ٦٠٩٧).

অর্থঃ "যে ব্যক্তি মানুষকে নাখোশ রেখে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে চায়, আল্লাহ তা'আলাই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন মানুষের সাহায্যের মোকাবেলায়। আর যে ব্যক্তি মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে মহান আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে, আল্লাহ তাকে মানুষের নিকট সোপর্দ করে দেবেন" (ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৬০৯৭)।

৫. হিংসা-বিদ্বেষঃ হিংসা-বিদ্বেষের তাড়নায় অনেকে অপরের গীবতে জড়িয়ে পড়ে। এই হিংসা-বিদ্বেষ শরী'আতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ তথা হারাম। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা একে অপরের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ কর না" (বুখারী)। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেছেন,

"دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ اَلْبَغْضَاءُ وَالْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ, لَيْسَ حَالِقَةُ الشَّعْرِ, وَلَكِنَّ حَالِقَةَ الدِّيْنِ" (أحمد, ترمذى, صحيح الجامع رقمالحديث ٣٣٦١).

অর্থঃ "তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির রোগ তথা হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা। আর এ ঘৃণাবোধ হলো মুণ্ডনকারী বিষয়। এটা চুল মুণ্ডনকারী নয়; বরং দ্বীন অর্থাৎ ইসলাম ধর্মকে মুণ্ডনকারী" (আহমাদ, তিরমিযী, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৩৩৬১)।

৬. বেশী বেশী অবসরে বা বেকার থাকা আর ক্লান্তি অনুভব করাঃ এধরনের মানুষই বেশী বেশী অপরের গীবত করে থাকে। কারণ তাদের কোন কাজ থাকে না। সময় কাটানোর মাধ্যম হিসাবে তারা ঐ নোংরা পথকে বেছে নেয়। এই ধরনের লোকদের উচিত হবে অবসর সময়কে আল্লাহর আনুগত্যে, ইবাদতে, ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনে এছাড়া দুনিয়া ও আখিরাতের উপকারে আসে এমন কাজে ব্যয় করা। তাহ'লে তারা অন্যের সমালোচনা করার সময় পাবে না। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ" (بخارى رقم الحديث ٢٩١).

অর্থঃ "দু'টি নে'আমত এমন রয়েছে, যার ব্যাপারে অনেক মানুষ ধোঁকাগ্রস্ত রয়েছে। সুস্থতা ও অবসর" (বুখারী হাদীছ নং ২৯১)। আর এজন্যেই রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্য একটি হাদীছে বলেছেন,

"اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ, شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَ غِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَ فَرَاغِكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ" (حــاكم, بيهقي , أحمد, صحيح الجامع رقم الحديث ١٠٧٧).

অর্থঃ "তুমি ৫টি বস্তুকে অপর ৫টি বস্তুর পূর্বে মূল্যায়ন করবে অর্থাৎ বিশেষভাবে গুরুত্ব দিবে। যৌবন কালকে বার্ধক্য আসার পূর্বে, সুস্থতাকে অসুস্থতার পূর্বে, সচ্ছল অবস্থাকে অসচ্ছল অবস্থা আসার পূর্বে, অবসর সময়কে ব্যস্ততার পূর্বে, জীবনকে মরণ আসার পূর্বে" (হাকেম, বায়হাকী, আহমাদ, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ১০৭৭)।

৭. নিজে নিজের প্রশংসা করা আর নিজের দোষ-ত্রুটির প্রতি কোন খেয়াল না করাঃ এ কারণেও অনেকে গীবতের কাজে জড়িয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَشُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ" (بزار ,بيهقى، صحيح الجامع رقم الحديث ٥٠)

অর্থঃ "ধ্বংসাত্মক বিষয়গুলি হলো, অনুসৃত বখীলী ও প্রবৃত্তি এবং আত্মপ্রশংসা করা অর্থাৎ নিজে নিজের প্রশংসা করা"(বাযযার, বায়হাকী, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৫০)।

৮. পরিবেশিত সংবাদ যাচাই-বাছাই না করে বিশ্বাস করাঃ অনেক সময় দেখা যায়, একটা সংবাদের উপর ভিত্তি করে অনেকে অনেক কিছু বলাবলি করে। অথচ যাচাই-বাছাই করার পর অনেক সময় সংবাদটি সম্পূর্ণ ভূয়া বা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এ প্রসঙ্গে একটা প্রসিদ্ধ গুজবের কথা উল্লেখ করা হলোঃ ছাহাবী ছা'আলাবা (রাঃ) নাকি খুবই গরীব মানুষ ছিলেন। তাই নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে নামায পড়া

শেষ হ'লেই তিনি বাড়ী দৌড়ে চলে যেতেন। নবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এমনটি কর কেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমরা স্বামী-স্ত্রী আমাদের একটি মাত্র কাপড় আছে। তাই আমি যখন নামায পড়তে আসি, তখন আমার স্ত্রী উলঙ্গ হয়ে ঘরে অপেক্ষায় থাকে। আমি বাড়ীতে গিয়ে আমার পরনের কাপড় খুলে দিলে সে তা পরিধান করে নামায আদায় করে। আর এ জন্যেই আমি নামায শেষে দ্রুত বাড়ীতে চলে যাই। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট তার জন্য স্বচ্ছলতার দরখাস্ত করলে নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার ধনসম্পদ বৃদ্ধির জন্য দু'আ করেন। ফলে অল্পদিনেই তিনি বড় ধনী হয়ে যান। ছাগল-গরুর পালে তার বাড়ী-ঘর সব ভরে যায়। ফলে তিনি ৫ ওয়াক্ত নামাযের জন্য মাসজিদে আসা ছেড়ে দিলেন। শুধু যোহর ও আছরের নামায মাসজিদে এসে জামা'আতে আদায় করতে লাগলেন। গরু-ছাগল আরো অনেক বেড়ে গেলে যোহর ও আছরেও মাসজিদে আসা ত্যাগ করলেন। তখন তিনি শুধু জুম'আর নামাযে শরীক হতেন। সম্পদ আরো অনেক বেড়ে গেলে তখন তিনি জুম'আয় আসাও বাদ দিয়ে দিলেন। এরপর নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক সময় তার কাছে যাকাত আদায় করার জন্য লোক পাঠালে তিনি যাকাত দিতেও অস্বীকার করলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জন্য আফসোস করেন, একারণে আল্লাহ তা'আলা তার সম্পর্কে আয়াতও নাযিল করলেন। পরবর্তীতে নিজে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট যাকাতের মাল নিয়ে আসলে তিনি তা ফিরিয়ে দেন। এরপর নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর

মৃত্যুর পর আবূ-বাকর (রাঃ) এর যামানায় তিনি যাকাতের মাল নিয়ে আবূ-বাকর (রাঃ) এর দরবারে হাজির হ'লে তিনিও তার যাকাতের মাল নিতে অস্বীকার করলেন। এমনিভাবে আবূ-বাকার (রাঃ) এর পর উমার ফারূক (রাঃ)-এর যামানায় তিনি যাকাতের মাল জমা দিতে আসলে- উমার ফারূক (রাঃ)ও একইভাবে তার যাকাতের মাল গ্রহণ করেন নাই। এমনিভাবে ওছমান (রাঃ)ও তাঁর যাকাতের মাল গ্রহণ করেন নি। আর এই ওছমান (রাঃ) এর যামানাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। (আল-কুরআনের গল্প শুনি পৃঃ ৪৬-৫১)। ঘটনাটি সহীহ নয়। (কাছাছুন লা-তাছবুতু ১/৪৩ পৃঃ, কিছ্ছা নং ৩) উক্ত ঘটনার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই। অথচ এই বানোয়াট কাহিনীর উপর ভিত্তি করেই জালীলুল ক্বদর ছাহাবী ছা'আলাবা (রাঃ) সম্পর্কে কত বড় ধরনের গীবত ও জঘন্য ঘটনা মানব সমাজে প্রচলিত আছে- এটা একবার ভেবে দেখার বিষয় নয় কি?

এরকমই আর একটি ঘটনাঃ দাঊদ (আঃ) নাকি আওরিয়া নামক এক ব্যক্তিকে কোন এক জিহাদে প্রেরণ করেছিলেন এজন্য যে, তার স্ত্রী খুবই সুন্দরী ছিল। জিহাদে সে শহীদ হ'লে, তিনি তার স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারবেন, আর বাস্তবে নাকি তিনি তাই করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি তাকে একাধিকবার যুদ্ধে পাঠান, যাতে সে নিহত হয়। এভাবে শেষবারে সে নিহত হ'লে তিনি তার সুন্দরী স্ত্রীকে বিয়ে করে নিয়েছিলেন। এ ঘটনাটিও একটি বানোয়াট ঘটনা।

কোন জাহেল, মূর্খ অথবা ইসলামের শত্রুরা আল্লাহর নাবী দাঊদ (আঃ) কে খাটো করে দেখানোর জন্য বা তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য উক্ত ঘটনা রচনা করেছে। অথচ উক্ত ঘটনা মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ; পরিবেশিত ঘটনা বা তথ্য যাচাই-

বাছাই না করার কারণে আল্লাহর নাবী ও রাসূলগণের নামেও এভাবে কখনো কখনো বড় ধরনের গীবত করা হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের দেশে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ছাহাবীদের সম্পর্কে আরেকটি খুব বড় ধরনের গীবত লোক সমাজে খুবই প্রচলিত। সেটা হলো, ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নাকি বগলে পুতুল রেখে নামায আদায় করতেন। আর এ জন্যেই নাকি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছাহাবীদেরকে নামাযে রাফউল ইয়াদায়েন করে নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন পুতুলগুলি সব ঝরে পড়ে যায়। এ কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। অথচ এই ভিত্তিহীন কথাটি কি আলেম আর কি জাহেল সকলের মুখে সমানভাবে শোনা যায়। এই ঘটনা যদি সত্যিই হয়, তবে কেন নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বয়ং নিজে রাফউল য়াদাঈন্ করেছিলেন, যার স্পষ্ট প্রমাণ বুখারী ও মুসলিম শরীফের একাধিক হাদীছে রয়েছে। তবে কি নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও বগলে পুতুল নিয়ে নামাযে হাজির হ'তেন? (নাঊযুবিল্লাহ)। জানি না, সর্ব প্রথম কোন জাহেল এই জঘন্য মন্তব্যটি করেছিল? ছাহাবীদের শানে এই ধরনের বে'আদবী, তাঁদের নামে এ ধরনের গীবত সত্যিকার অর্থেই খুবই অপরাধের বিষয়। আল্লাহ আমাদেরকে এ ধরনের খারাপ আক্বীদা হ'তে তওবা করার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন।

'খেলাফাত ও মুলক' কিতাবে বর্ণিত উছমান ও মু'আবিয়া (রাঃ) আর আমর ইবনুল আছ (রাঃ) ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ইতিহাসে বর্ণিত অভিযোগগুলির কোন সঠিক ভিত্তি নেই। অথচ এ সমস্ত ভিত্তিহীন ইতিহাসে প্রবিবেশিত ভিত্তিহীন কথাগুলিকে কেন্দ্র করে বিশেষ একটি মহল ছাহাবীদের ব্যাপারে অনর্থক

সমালোচনায় রত আছে। অভিযোগগুলির মূল বর্ণনা সূত্র হলো ঐ সমস্ত ঐতিহাসিক কিতাব, যাদের লেখকগণ স্বয়ং নিজেরাই ঐ ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলির সত্যাসত্যের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। কাজেই ইতিহাসের এসব মিথ্যা ও বানোয়াট বর্ণনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ছাহাবীদের সমালোচনায় লিপ্ত হওয়া নির্বুদ্ধিতা, মূর্খতা এবং শী'আ বা রাফেযী মতবাদের অনুকরণ করা ছাড়া আর কিছু নয়।

গীবতকারী ও গীবত শ্রবণকারী পাপের দিক থেকে সকলেই সমানঃ এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ" (مسلم, صحيح سنن أبو داود رقم الحديث ١٠٣٤, صحيح الجامع رقم الحديث ٦٢٥٠).

অর্থঃ "তোমাদের কেউ যদি কোন মুনকার তথা অন্যায় কাজ দেখে, তাহ'লে সে যেন তার প্রতিবাদ করে হাত দিয়ে, যদি সে হাত দিয়ে প্রতিবাদ করতে সক্ষম না হয়– তাহ'লে সে যেন যবান অর্থাৎ মুখ দিয়ে তার প্রতিবাদ করে। আর যদি মুখ দিয়ে প্রতিবাদ করা তার পক্ষে সম্ভব না হয়–তাহ'লে সে যেন অন্তত অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে। আর এই অন্তর দিয়ে ঘৃণা করা– এটা হলো সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক" (মুসলিম, ছহীহ সুনানু আবূদাঊদ হাদীছ নং ১০৩৪, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৬২৫০)। গীবত করা যেহেতু একটি বড় অন্যায় কাজ, সেহেতু তারও প্রতিবাদ করা একান্ত উচিত। আর যদি কেউ শক্তি থাকতেও প্রতিবাদ না করে, তবে সেও গীবতকারী হিসাবে গণ্য হবে।

আবূ বাকর (রাঃ) ও উমার (রাঃ) এই দু'জনের একজন মাত্র এ উক্তিই করেছিলেন যে, দেখ এই লোকটি বাড়ীর ঘুমের মত

ঘুমাচ্ছে অর্থাৎ সে এতো ঘুমে অচেতন যে, মনে হচ্ছে সে যেন সফরে নেই বরং নিজ বাড়ীতে রয়েছে। অথচ নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের উভয়কেই গীবতকারী হিসাবে গণ্য করেছেন। আর এজন্যেই উমার ইবনু আব্দুল আযীয গীবতকারীর সম্পর্কে তদন্ত করতেন। একদা কোন এক ব্যক্তি তার সামনে অপর এক ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করলে তিনি তাকে বললেন, যদি তুমি চাও তাহলে আমরা তোমার এ বিষয়টাকে যাচাই-বাছাই করব। যদি তুমি মিথ্যুক হও, তাহ'লে তুমি এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات:٦)

অর্থঃ "যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহ'লে তোমরা সে বিষয়ে যাচাই-বাছাই করে দেখ" (আল-হুজুরাত, ৬)। আর যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবুও তুমি এই আয়াতের আওতাভুক্ত হবে-

﴿هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ﴾ (القلم: ١١)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি মানুষের পিছনে দুর্নাম করে বেড়ায় আর একজনের কথা অন্যজনের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়" (আল-ক্বালাম,১১)। আর যদি চাও আমরা তোমাকে ক্ষমা করে দেব। তখন সে লোকটি বলল, ক্ষমা করুন হে আমীরুল মু'মেনীন! আর কখনো পুনরায় এ কাজ করব না" (আল-হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম, ২৯২)।

মুসলিম ব্যক্তির মান-সম্মান রক্ষা করার ফযীলতঃ

একজন মুসলিম ব্যক্তির মর্যাদা সবকিছুর শীর্ষে। একদা ইবনু উমার (রাঃ) ক্বা'বা শরীফকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "হে

কা'বা! তুমি কতই না মহান, আর তোমার সম্মানও কতই না মহান, কিন্তু তোমার চেয়েও একজন মু'মিন বান্দা বেশী মর্যাদাসম্পন্ন" (তিরমিযী, ইবনু হিব্বান ও অন্যান্য, হাদীছ হাসান, গায়াতুল মারাম হাদিছ নং ৪৩৫)। এ প্রসঙ্গে নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেছেন,

"مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ كَانَ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ" (صحيح الجامع، رقم الحديث ٦١٣٩).

অর্থঃ "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের ইয্যত-আবরূ, মান-সম্মান রক্ষা করবে, এটা তার জন্য জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী আড় স্বরূপ হয়ে যাবে" (ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৬১৩৯)। এ প্রসঙ্গে অন্য হাদীছে এসেছে,

"عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَرْفُوْعًا: مَنْ ذَبَّ عَنْ عِـرْضِ أَخِيْهِ بِالْغَيْبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ" (أحمد، طبراني، حديث صحيح، صحيح الجامع رقم الحديث ٦٢٤٠، غاية المرام حديث ٤٣١، صحيح الترغيب).

অর্থঃ "আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে ভাইয়ের ইযযতের পক্ষে থেকে অন্যের কৃত গীবত বা সমালোচনাকে প্রতিহত করবে, তাহ'লে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র দায়িত্ব হয়ে যাবে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করা"(আহমাদ, ত্বাবারাণী, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৬২৪০, গায়াতুল মারাম হাদীছ নং ৪৩১, ছহীহ আত-তারগীব, হাদীছ ছহীহ)।

যে সকল ক্ষেত্রে গীবত করা জায়েযঃ

গীবত করা সাধারণভাবে হারাম হলেও এমন কিছু ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে গীবত করা কোন সময় জায়েয, আবার কোন সময় ওয়াজিবও হয়ে যায়। গীবত করা যে সব অবস্থায় জায়েয সে অবস্থাগুলি সংক্ষিপ্ত ব্যখ্যাসহকারে নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

এ প্রসঙ্গে কোন এক আরাবী কবি বলেছেন,

اَلْقَدْحُ لَيْسَ بِغِيْبَةٍ فِي سِتَّةٍ ـــــ مُتَظَلِّمٌ, مُعَرِّفٌ, مُحَذِّرٌ

وَمُجَاهِرٌ فِسْقًا وَ مُسْتَفْتٍ ـــــ وَ مَنْ طَلَبَ الْإِعَانَةَ فِي إِزَالَةِ مُنْكَرِ

অর্থঃ "৬ জনের ক্ষেত্রে সমালোচনা করা গীবত নয়। যে মাযলুম, যে পরিচয়দানকারী, যে সতর্ককারী, যে প্রকাশ্য ফাসেকীতে লিপ্ত, যে ফৎওয়া তলব করে, আর যে অন্যের কাছে সাহায্য চায় অন্যায় কাজ দূরীভূত করার জন্য" (শরহুল আক্বীদা আত-ত্বাহাবীয়া, আলবানীর ভূমিকা দ্রঃ, আমসিক আলাইকা লিসানাকা, ৫১পৃঃ)।

১- মাযলুম ব্যক্তির জন্য গীবত করা জায়েযঃ এটা কুরআন মাজীদের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿لاَ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا﴾ (النساء:١٤٨)

অর্থঃ "কারো ব্যাপারে কোন খারাপ কথা প্রকাশ করা মহান আল্লাহ পসন্দ করেন না, তবে যে নির্যাতিত তার কথা ভিন্ন। আর আল্লাহ তা'আলা সব কিছুই শুনেন ও সব কিছুই জানেন" (আন-নিসা, ১৪৮)।

২- পরিচয় দানকারীঃ অনেক সময় কোন ব্যক্তির পরিচয় দিতে গিয়ে বাধ্য হয়ে তার দোষ-গুণ মানুষের সামনে বলতে

হয়। যেমন- বলা হয় অমুক অন্ধ হাফেয, অমুক খোঁড়া মানুষ। প্রয়োজনের তাকীদে পরিচয়ের জন্য কোন মানুষের এ ধরনের দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করা জায়েয আছে। তবে শুধু পরিচয়ের জন্যেই এ ধরনের দোষ-ত্রুটি বলা যাবে। এ ছাড়া কোন প্রকারে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে এ ভাবে বলা সম্পূর্ণ নিষেধ তথা হারাম হিসাবে গণ্য হবে।

হাদীছে এসেছে, ছাহাবী ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি একজন অন্ধ মানুষ ছিলেন। তিনি নামাযের আযান দিতেন না, যতক্ষণ না তাকে বলা হ'ত, আপনি সকাল (ফজর) করে ফেলেছেন, আপনি সকাল (ফজর) করে ফেলেছেন" (বুখারী, হাদীছ নং ৬১৭)।

মুসলিম শরীফে এসেছে, "নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম)-এর দুইজন মুয়াযি্যন ছিল। একজন বিলাল (রাঃ) আর একজন অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)" (ছহীহ মুসলিম, 'ছিয়াম' অধ্যায়, হাদীছ নং ৩৮)। অত্র হাদীছে আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)-কে কেবলমাত্র পরিচিতির জন্যেই অন্ধ বলা হয়েছে।

৩- অপরকে নছীহত করাঃ কোন মানুষের কল্যাণ কামনার উদ্দেশ্যে অন্য কোন চরিত্রহীন ও দুষ্ট লোকের অনিষ্ট বা ক্ষতি থেকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে তাদের দোষ-গুণ মানুষের সামনে বলা জায়েয আছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا لِمَنْ ؟ قَالَ للهِ وَ لِكِتَابِهِ وَ لِرَسُوْلِهِ وَ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَ عَامَّتِهِمْ" (مسلم رقم الحديث ١٢).

অর্থঃ "ইসলাম ধর্ম উপদেশের উপর ভিত্তিশীল। (হাদীছ বর্ণনাকারী তামীমুদ্দারী বলেন) আমরা বললাম, কাদের জন্য (এই উপদেশ)? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন, "আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলমানদের ইমামদের জন্য আর তাদের সাধারণ লোকদের জন্য" (মুসলিম হাদীছ নং ১২)। হাদীছ যাচাই-বাছাই এর ক্ষেত্রে হাদীছের বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে মুহাদ্দেছীনদের আলোচনা-সমালোচনা করা– এটাও এক প্রকার বৈধ গীবতেরই অন্তর্ভুক্ত। এ প্রকার গীবত করা ওয়াজিব। আর এজন্যে কোন কোন মুহাদ্দিছ বলতেন, আসুন আমরা আল্লাহর ওয়াস্তে কিছুক্ষণ গীবত করি (হাদীছ শাস্ত্রের গ্রন্থাদি দ্রঃ)। আল্লামা শাওকানী (রাহিঃ) বলেন, এই ধরনের সমালোচনা করা ওয়াজিব (দ্রঃ রফউর রী-বাহ ফী-মা ইয়াজূযু ওয়ামা লা-ইয়াজূযু মিনাল গী-বাহ)।

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই এই প্রকার সমালোচনা করেছেন। নিম্নে এ বিষয়ের কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করা হলো। নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কয়েকজন লোক সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন,

"مَا أَظُنُّ فُلاَنًا وَ فُلاَنًا يَعْرِفُ مِنْ دِيْنِنَا شَيْئًا" (بخاري كتاب الأداب رقم الحديث ٦٠٦٧).

অর্থঃ "আমার মনে হয় না যে, অমুক অমুক লোক আমাদের ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কিছু জানে" (বুখারী, আদব অধ্যায় হাদীছ নং ৬০৬৭)।

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এক ব্যক্তি আসার অনুমতি চাইলে তিনি বললেন, তাকে অনুমতি দাও। এ লোকটি তার গোত্রের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ লোক। সে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আসলে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সাথে খুব নরম ভাষা ব্যবহার করলেন। তিনি বললেন, আয়েশা! নিশ্চয়ই সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সেই, যাকে মানুষ পরিত্যাগ করেছে তার ফাহেশা কথা ও কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য" (ছহীহ বুখারী, আদব অধ্যায়, হাদীছ নং ৬০৫৬, মুসলিম হাদীছ নং ২৫৯১)।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রাহিঃ) বলেন, বিদ'আতী নেতৃবৃন্দের মতই কুর'আন ও হাদীসের বিরুদ্ধাচারণকারী ও ইবাদতকারীগণের অবস্থা বর্ণনা করা এবং তাদের থেকে উম্মাতকে সতর্ক করা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব। এমনকি ইমাম আহমাদ (রাহিঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, একজন ব্যক্তি রোযা রাখে, নামায পড়ে, ইতেকাফে বসে ইত্যাদি। ঐ ব্যক্তির এসমস্ত ভাল কাজগুলি আপনার নিকট বেশী প্রিয়, নাকি এটা বেশী প্রিয় যে, সে বিদ'আতীদের সম্পর্কে কথা বলবে ও মানুষকে সতর্ক করবে? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, যদি সে নামায, রোযা ও ইতেকাফ ইত্যাদি ইবাদত-বন্দেগী করে তবে সেটা তার জন্যেই হবে। কিন্তু যদি সে বিদ'আতীদের বিরুদ্ধে কথা বলে, তবে তা সমস্ত মুসলিমদের স্বার্থে হবে। সুতরাং এটাই তার চেয়ে উত্তম...(মাজমূউল ফাতাওয়া ২৮/২২১)।

৪– প্রকাশ্য ফাসেকীতে লিপ্ত ব্যক্তির সমালোচনা করা জায়েযঃ এটা হারাম গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন- প্রকাশ্য

মদখোর, ডাকাত, গুণ্ডা এধরনের লোকদের সমালোচনা করতে কোন দোষ নেই। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রাহিঃ) বলতেন, ফাসেক লোকের ক্ষেত্রে কোন গীবত নেই অর্থাৎ তাদের গীবত করা দোষের কিছু নয়। হাছান বাছরী হতে বর্ণিত তিনি বলেন, কোন বিদ'আতীর ব্যাপারে সমালোচনা করলে যেমন কোন গীবত নেই, এমনিভাবে প্রকাশ্য ফাসেকীতে লিপ্ত ব্যক্তি সম্পর্কে সমালোচনা করলেও তাতে কোন গীবত নেই (ইমাম লালাকাঈ, শারহু উছূলে ই'তেক্বাদে আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত ১/১৪০,মাওক্বেফু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত মিন আহলিল আহওয়া ওয়াল বিদ'আহ ২/৪৯৬)।

৫— ফতওয়া তলবকারী ও সুপরামর্শ দানকারীঃ ফতওয়া তলব করতে গিয়ে কারো দোষ-গুণ আলোচনা করার প্রয়োজন দেখা দিলে, তার জন্য ঐ সমালোচনা করা জায়েয। তবে নিয়ত খালেছ থাকতে হবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীছে বর্ণিত আছে যে, হিন্দা (রাঃ) নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দরবারে এসে অভিযোগ করে বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আবূ সুফয়ান (স্বীয় স্বামী) একজন কৃপণ লোক, সে আমার ও আমার সন্তানদের জন্য যে পরিমাণ খাদ্য-দ্রব্য অর্থাৎ খরচ-খরচার প্রয়োজন তা ঠিকমত আমাদেরকে দেয়না। এমতাবস্থায় আমি যদি তাকে না জানিয়ে তার ধনসম্পদ হ'তে কোন কিছু নিয়ে ফেলি, তাহ'লে কি আমার কোন গুনাহ হবে? একথা শুনে নাবী কারীম তাকে বললেন, তোমার ও তোমার ছেলে-মেয়েদের জন্য অতিরিক্ত যে পরিমাণ জিনিষের প্রয়োজন হয়- ঠিক সে পরিমাণ জিনিস তুমি তোমার স্বামীর ধনসম্পদ থেকে নিয়ে নিবে।

এমনিভাবে যদি কেউ কারো কাছে কারো সম্পর্কে ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে কি-না এ

সম্পর্কে সুপরামর্শ চায়, তবে তাকে অবশ্যই তার দোষ-গুণ বলে দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ"

অর্থঃ "যার নিকট পরামর্শ তলব করা হয়, সে একজন আমানতদার" (সুনান চতুষ্টয়, আহমাদ, হাকেম, ত্বাহাবী, দারেমী, ইবনু হিব্বান, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৬৭০০)।

নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে ফাতেমা বিনতু ক্বায়েস (রাঃ) বললেন, তাকে মু'আবিয়া ও আবূ-জাহাম বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম) তাকে বললেন, 'মু'আবিয়া' হ'লো ফক্বীর। তার কোন ধন-সম্পদ নেই। আর 'আবূ-জাহাম' এর বৈশিষ্ট্য হলো, সে কাঁধ থেকে লাঠি (মাটিতে) রাখে না অর্থাৎ স্ত্রীদেরকে সে অধিক মার-ধর করে। বরং তুমি উসামাকে বিবাহ কর" (মুসলিম, 'তালাক্ব' অধ্যায়, হাদীছ নং ১৪৮০)।

৬— যে ব্যক্তি শরী'আত বিরোধী অন্যায় কাজ সমাজ থেকে দূর করার জন্য ক্ষমতাশালী লোকদের নিকট হ'তে সাহায্য তলব করে— তার জন্য প্রয়োজনে অন্যের গীবত করা জায়েয। যেমন কেউ কোন মহল্লার কোন মাস্তানের উৎপাতে বিপদগ্রস্ত। এমতাবস্থায় ঐ এলাকা মাস্তানদের সকল তৎপরতা অর্থাৎ অন্যায়-অপকর্ম বন্ধের জন্যে থানায় তাদের পরিচয় ব্যক্ত করা জায়েয, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। মোট কথা স্বাভাবিকভাবে অন্যের গীবত করা হারাম হলেও উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলিতে গীবত করা জায়েয আছে।

তবে একথা সকলের জেনে রাখা উচিত যে, উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলিতে অন্যের গীবত করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে ২টি শর্ত রয়েছে। ১. 'নিয়ত খালেছ বা সঠিক হওয়া'। ২. 'প্রয়োজন দেখা দেওয়া' (আল-হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম ২৯০)। অর্থাৎ নিয়তের মধ্যে যদি কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য হয়, তবে তা গীবত বলে গণ্য হবে। বিনা প্রয়োজনে অন্যের কোন বিষয় নিয়ে সমালোচনা ও পর্যালোচনা করাও গীবতের ভিতর গণ্য হবে। অতএব আমাদের সকলের উপর অপরিহার্য কর্তব্য হবে জিহবাকে সংযত রাখা। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ".

অর্থঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রতি আর পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তার উচিত হবে এটাই– সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে"।

গীবতকারীর তওবাঃ

গীবতকারীর তওবার জন্য বেশ কয়েকটি শর্ত রয়েছে, যা নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

১– কৃত কর্মের জন্য লজ্জিত হওয়া।

২– ঐ কৃতকর্ম পুনরায় না করার জন্য দৃঢ়ভাবে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

৩– ঐ গুনাহ হ'তে বিরত থাকা।

৪– যার গীবত করা হয়েছে তার নিকটে ক্ষমা চাওয়া।

যেমন, আবূ-বাকর (রাঃ) ও উমার (রাঃ) এবং তাঁদের খাদেমের ঘটনা যা এর পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর ক্ষমা তলব করতে গিয়ে যদি ফিৎনার সৃষ্টি হয়, তাহলে সরাসরি ক্ষমা

চাওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে এবং তার দুর্নাম রটানোর পরিবর্তে তার প্রশংসা করবে। তাহ'লে ইনশা'আল্লাহ তার তওবাহ আল্লাহর দরবারে কবুল হবে (আমসিক আলায়কা লিসানাকা, ৫৭)।

গীবত সম্পর্কে সালাফে ছালেহীনদের কিছু উক্তিঃ

১– উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, "তোমরা আল্লাহর যিকির করবে কারণ তা আরোগ্য স্বরূপ। আর তোমরা মানুষের দোষ-গুণ বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকবে। কারণ সেটা হলো ব্যাধি স্বরূপ"।

২– ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, "যখন তুমি তোমার কোন সাথীর দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করার ইচ্ছা করবে, তখন তুমি তোমার দোষ-ত্রুটির কথা স্মরণ করবে"।

৩– আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি একদা একটি মৃত খচ্চরের পাশ দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করার সময় তার কিছু সাথীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, কোন ব্যক্তির পক্ষে অন্য কোন মুসলিম ভাইয়ের গোশত খাওয়া অপেক্ষা এই খচ্চরটির গোশত খেয়ে পেট ভর্তি করাই অনেক ভাল।

৫– হাসান বছরী (রাহিঃ) হ'তে বর্ণিত, তাঁকে কোন এক ব্যক্তি বলেছিল যে, আপনি আমার গীবত করেছেন। এর উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তোমার মর্যাদা আমার নিকট এমন পর্যায়ে পৌছেনি যে, আমি তোমাকে আমার নেকীসমূহের হাকীম বানিয়ে দিব। (অর্থাৎ তোমাকে স্বাধীনতা দিয়ে দিব আমার নেকী নিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে, আমার নিকট তুমি এমন মর্যাদায় উপনীত হওনি)।

৬– কথিত আছে যে, কোন এক আলেমকে বলা হলো, অমুক ব্যক্তি আপনার গীবত করেছে।

তখন তার নিকটে তিনি তাজা খেজুর ভর্তি একটি প্লেট পাঠিয়ে দিলেন আর বললেন, আমার নিকটে এ মর্মে সংবাদ পৌছেছে যে, আপনি আমাকে আপনার নেকীগুলি হাদীয়া দিয়েছেন। সুতরাং আমিও তার কিছু বদলা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। আমাকে ক্ষমা করবেন। কারণ আমি আপনার ঐ নেকীগুলির বদলা পূর্ণাঙ্গরূপে দিতে অক্ষম।

৭- ইবনু মুবারক (রাহিঃ) বলতেন, 'যদি আমি কারো গীবত করতাম তবে অবশ্যই আমি আমার পিতা-মাতার গীবত করতাম। কারণ তারাই আমার নেকী পাওয়ার বেশী হক্বদার" (আমসিক আলায়কা লিসানাকা, ৫৮-৫৯)।

পরনিন্দাসহ যে কোন খারাপ কথা হ'তে যবানকে আয়ত্বে রাখার ফযীলতঃ এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার লজ্জাস্থান ও যবানকে আয়ত্বে রাখার যামিন হবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যামিন হব" (বুখারী ও মুসলিম)। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আরো একটি হাদীছ নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

"عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ كُلُّ مَخْمُوْمِ الْقَلْبِ, صَدُوْقُ اللِّسَانِ, قَالُوْا صَدُوْقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُوْمُ الْقَلْبِ ؟ قَالَ هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ الَّذِيْ لاَ إِثْمَ فِيْهِ وَ لاَ غِلَّ وَلاَ حَسَدَ"

(ابن ماجه رقم الحديث ٤٢١٦ , حديث صحيح, ٤١١/٢).

অর্থঃ "আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন্ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "যে মাখমূমুল ক্বালব আর সত্যভাষী জিহবার অধিকারী"। তখন ছাহাবীরা বললেন, আমরা তো জানি সত্যভাষী কাকে বলে। হে আল্লাহর রাসূল! (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবার আপনি আমাদেরকে বলে দিন যে, 'মাখমূমুল ক্বালব' কাকে বলে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম) বললেন, সে হলো পূত-পবিত্র পরহেযগার ব্যক্তি, যার মধ্যে কোন পাপ নেই, খেয়ানত নেই, হিংসা-বিদ্বেষ নেই" (ইবনু মাজাহ হাদীছ নং ৪২১৬, হাদীছ ছহীহ ২/৪১১)।

এ হাদীছ থেকে আমরা জানতে পারলাম গীবত বা পরনিন্দা করা কী ভয়াবহ! অতএব আমাদের উচিত হবে- বিনা প্রয়োজনে কারো গীবত না করা আর সালাফে ছালেহীনদের ন্যায় আমরাও যেন নিজেদের অন্তরকে পরিষ্কার রাখি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সেই তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

৫২. চোগলখুরী করা

(اَلنَّمِيْمَةُ)

মানুষের মাঝে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি ও সম্পর্কের অবনতি ঘটানোর উদ্দেশ্যে একজনের কথা অন্যজনের নিকটে লাগানোকে চোগলখুরী বলে। চোগলখুরীর ফলে মানুষের সম্পর্কে ফাটল ধরে আর তাদের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার আগুন জ্বলে ওঠে। চোগলখুরীর কার্যক্রম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِيْنٍ - هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ﴾ (القلم: ١٠-١١)

অর্থঃ "যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, যে মানুষের পিছনে নিন্দা করে, আর একজনের কথা অন্যজনের নিকট লাগায়- (হে রাসূল! (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) আপনি তার অনুসরণ করবেন না" (আল-ক্বলম,১০-১১)। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চোগলখুরীর পরিণাম সম্পর্কে বলেছেন,

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

অর্থঃ "চোগলখুর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না" (বুখারী, ফাতহুল বারী ১০/৪৭২)। চোগলখুরীর পরিণতি সম্পর্কে হাদীছে আরো বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِيْ قُبُوْرِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُعَذَّبَانِ , وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى وَ فِيْ رِوَايَةٍ: وَ إِنَّهُ لَكَبِيْرٌ كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَ كَانَ الْآخَرُ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ (بخاري, فتح الباري ١/٣١٧).

অর্থঃ "ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা এক খেজুর বাগানের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেখানে তিনি ক্বরের ভিতরে দু'জন লোকের আহাজারি অর্থাৎ চিৎকার শুনতে পেলেন। তখন তাদেরকে ক্বরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল। নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন বললেন, এ দু'জনকে আযাব দেওয়া হচ্ছে। তবে বড় কোন কারণে নয়। তবে অবশ্যই এগুলি কবীরা গুনাহ্। তাদের একজন পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করত না। আর অন্যজন চোগলখুরী করে বেড়াত" (বুখারী, ফতহুল বারী ১/৩১৭)।

চোগলখুরীর একটা নিকৃষ্ট পদ্ধতি বা স্তর সেটা হলো, স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে আর স্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বামীকে ক্ষেপিয়ে তাদের সম্পর্কে ফাটল ধরানো। এমনিভাবে অনেক কর্মজীবী শ্রমিক কর্তৃক তাদের পরিচালক কিংবা দায়িত্বশীলদের নিকট অন্য কোন কর্মজীবির কথা সমালোচনা করা। এতে তার উদ্দেশ্য হলো উক্ত কর্মজীবীর ক্ষতি সাধন করা আর নিজেকে উক্ত দায়িত্বশীলের

নিকটে শুভাকাংক্ষী বা খায়েরখাহ হিসাবে প্রমাণ করা। এ সমস্ত কাজ চোগলখুরী হিসাবে গণ্য, আর যা পরিষ্কার হারাম। মহান আল্লাহ এ সমস্ত পাপের কাজ হ'তে আমাদেরকে দূরে থাকার তাওফীক্ব দান করুন, আমীন।

৫৩. অনুমতি ছাড়া অন্য কারো বাড়ীতে উঁকি দেওয়া ও প্রবেশ করাঃ

(اَلْاِطِّلَاعُ عَلَى بُيُوْتِ النَّاسِ دُوْنَ إِذْنِهِمْ)

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلَى أَهْلِهَا﴾ (النور:٢٧)

অর্থঃ "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তোমাদের বাড়ী ব্যতীত অন্য কারো বাড়ীতে তার মালিকের অনুমতি ও ছালাম দেওয়া ব্যতীত প্রবেশ করো না" (আন-নূর, ২৭)। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো পরিষ্কার করে বলেছেন,

"إِنَّمَا جُعِلَ الْاِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ"

অর্থঃ "দৃষ্টিপাতের কারণেই কেবল অনুমতির ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে" (বুখারী, ফাতহুল বারী ১১/২৪)।

আধুনিক কালের বাড়ীগুলি পাশাপাশি গড়ে উঠেছে। তাদের বিল্ডিং বা ঘরগুলি যেন অনেক সময় একটা অপরটার সাথে মিলিত। দরজা জানালাও অনেক সময় সামনা সামনি তৈরী করা হয়। এমতাবস্থায় এক প্রতিবেশীর সামনে অন্য প্রতিবেশীর সতর অর্থাৎ পর্দা প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে।

কুরআন মাজীদে মু'মিন নর-নারীর উভয়ের চক্ষুকে সংযত করে রাখার নির্দেশ থাকলেও অনেকে তা মেনে চলে না। অনেকে উপর তলার জানালা কিংবা ছাদ থেকে নীচের অধিবাসীদের সতর ইচ্ছে করে দেখে। নিঃসন্দেহে এটা খিয়ানত করা, আর প্রতিবেশীর সম্মানে আঘাত করা– যেটা পরিষ্কার হারাম। এর ফলে পারস্পরিক অনেক রকম বিপদ ও ফিৎনার সৃষ্টি হয়। এরূপ গোয়েন্দাগিরী যে কত ভয়াবহ তার প্রমাণ বহণ করে ইসলামী বিধান– কেননা ইসলামী শরী'আত এ অবস্থায় ঐ ব্যক্তির চোখ ফুঁড়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

"مَنْ اِطَّلَعَ فِيْ بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَّفْقَؤُوْا عَيْنَـــهُ, (رواه مسلم) وَ فِيْ رِوَايَةٍ فَفَقَؤُوْا عَيْنَهُ فَلاَ دِيَةَ لَـــهُ وَلاَ قِصَـــاصَ" (رواه احمد).

অর্থঃ "যে ব্যক্তি কারো বাড়ীতে তাদের অনুমতি ছাড়া উঁকি দেয় বা প্রবেশ করে তাদের জন্য তার চোখ ফুঁড়ে দেওয়া জায়েয হয়ে যাবে" (মুসলিম ৩/১৬৯৯)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, প্রবেশের কারণে যদি তারা তার চোখ ফুঁড়ে দেয় তাহ'লে সেজন্য কোন রক্তমূল্য বা ক্বিছাছ দিতে হবে না" (আহমাদ ২/৩৮৫, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৬০২২)।

৫৪. তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে শুধু দু'জনে পরামর্শ করা

(تَنَاجِي اثْنَيْنِ دُوْنَ الثَّالِثِ)

আমাদের সভা-সমিতিগুলির জন্য একটা বড় বিপদ হলো– ব্যক্তি বিশেষকে বাদ দিয়ে অন্য দু'একজনকে নিয়ে যুক্তিপরামর্শ করা। এতে শয়তানের পথ অনুসরণ করা হয়। কেননা এ জাতীয় কাজের ফলে মুসলমানদের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হয় আর একজনের প্রতি অন্যজনের মন ভেঙ্গে যায়। এ ধরনের যুক্তি পরামর্শের ফলাফল ও বিধান সম্পর্কে মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى رَجُلاَنِ دُوْنَ الْآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ أَجْلَ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ" (بخاري, فتح الباري ١١/٨٣).

অর্থঃ "যখন তোমরা ৩ জন হবে তখন যেন ২ জন লোক অন্য একজনকে বাদ রেখে কোন পরামর্শ না করে। তোমরা মানুষের সাথে মিলেমিশে পরামর্শ কর। কারণ তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে কোন পরামর্শ করলে ঐ ব্যক্তি অবশ্যই মনে কষ্ট পাবে" (বুখারী, ফাতহুল বারী ১১/৮৩)।

এভাবে ৪ জনের মধ্যে ১ জনকে বাদ রেখে ৩ জনে পরামর্শ করাও নিষিদ্ধ। এমনিভাবে তৃতীয়জন বোঝে না এমন অবস্থায়ও শুধু ২ জনে মিলে যুক্তি-পরামর্শ করাও জায়েয নয়। কারণ এভাবে তৃতীয় জনকে বাদ দেওয়ায় তার প্রতি একপ্রকার তাচ্ছিল্য ভাব দেখানো হয়। কিংবা তারা দু'জনে যে তার প্রসঙ্গে কোন খারাপ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এরূপ ধারণা তার মনে সৃষ্টি হ'তে পারে। সুতরাং কারো মনে ব্যথা না দিয়ে সবাই মিলে পরামর্শ করতে হবে। মোট কথা একটা সভার কিছু সদস্যকে বাদ রেখে অন্য সদস্যগণকে নিয়ে পরামর্শ করা কোন প্রকারেই জায়েয নয়।

৫৫. টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করা

(اَلْإِسْبَالُ فِي الثِّيَابِ)

মানুষ যে সব অন্যায় কাজকে সামান্য বা হালকা মনে করে অথচ তা আল্লাহর নিকটে বড় পাপের কাজ হিসাবে গণ্য, এমন ধরনের পাপ কাজসমূহের মধ্য হ'তে পায়ের টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করা একটি। ইসলামী বিধান মতে পায়ের টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে কাপড়, প্যান্ট ও লম্বা জামা পরিধান করা পুরুষদের জন্যে নামাযের ভিতরে ও বাইরে তথা সর্বাবস্থায় হারাম। আর এ ভাবে পায়ের টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরা কাফির, মুশরিক তথা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের অভ্যাস। এটা মুসলমানদের আদব নয়। অথচ বর্তমান অধিকাংশ মুসলমান ভাইদের যেন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে, প্যান্ট পরলেই টাখনুর নিচে ৩/৪ আংগুল ঝুলিয়ে পরতে হবে– যা স্পষ্ট হারাম। আর অনেকেই কাপড় এত লম্বা করে ঝুলিয়ে পরে যা মাটি স্পর্শ করে। কেউবা আবার পরিধেয় কাপড় দ্বারা পিছন দিক থেকে রাস্তা ঝাড়ু দিতে দিতে চলতে থাকে। টাখনুর নীচে এভাবে কাপড় ঝুলিয়ে পরা হারাম। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কয়েকটি হাদীছ নিম্নে উল্লেখ করা হলো। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

" ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لاَيُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ اَلْمُسْبِلُ وَفِيْ رِوَايَةٍ إِزَارَهُ وَ الْمَنَّانُ (وَفِي رِوَايَةِ الَّذِيْ لاَ يُعْطِي شَيْئًا إِلاَّ مَنَّهُ) وَ الْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ" (مسلم ١/١٠٢). অর্থঃ "৩ প্রকার লোকের সাথে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। তাদেরকে পবিত্র করবেন না; বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণা দায়ক শাস্তি। তারা হলো টাখনুর নীচে কাপড় (অন্য বর্ণনায় লুঙ্গি) পরিধান কারী, খোঁটা দানকারী (অন্য বর্ণনায় এসেছে যে খোঁটা না দিয়ে কাউকে কোন কিছু দান করে না) ও মিথ্যা শপথের সাহায্যে পণ্য সামগ্রী বিক্রয়কারী" (মুসলিম ১/১০২)। অনেকেই বলে যে, আমার টাখনুর নীচে কাপড় পরা অহংকারের উদ্দেশ্যে নয়– তার এ সাফাই গাওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা টাখনুর নীচে কাপড় পরা অহংকারের সাথেই হোক আর অহংকার ছাড়াই হোক শাস্তি উভয়টাতেই সমান হবে। কেননা এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنْ إِزَارٍ فَفِي النَّارِ"

অর্থঃ "টাখনুর নীচে কাপড়ের যে টুকু থাকবে তা জাহান্নামে যাবে" (আহমাদ ৬/২৫৪, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৫৫৭১)।

এ হাদীছে অহংকার এবং অহংকার ছাড়া এ দুইয়ের মাঝে কোন পার্থক্য করা হয়নি। আর জাহান্নামে গেলে শরীরের কোন অংশ বিশেষ যাবে না; বরং সমগ্র দেহই যাবে। অবশ্য অহংকারের সাথে যে টাখনুর নীচে কাপড় পরবে তার শাস্তি তুলনামূলকভাবে কঠিন ও বেশী হবে। এ কথাই রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (بخاري رقم الحديث ٣٤٦٥).

অর্থঃ "যে ব্যক্তি অহংকারের সাথে তার লুঙ্গি মাটির সাথে টেনে নিয়ে বেড়াবে, ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দৃষ্টি দিবেন না" (বুখারী হাদীছ নং ৩৪৬৫)। বেশী শাস্তি এ জন্য হবে যে, সে এক সঙ্গে ২টি হারাম কাজ করেছে। ১. টাখনুর

নীচে কাপড় পরা, ২. অহংকার প্রকাশ করা। মোটকথা হলো, নির্ধারিত পরিমাণ থেকে নীচে ঝুলিয়ে যে কোন কাপড় পরিধান করাই হলো 'নসবাল' অর্থাৎ কাপড় ঝুলিয়ে পরার অন্তর্ভুক্ত, আর তা পরিষ্কার হারাম। ইবনু উমার (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

" اَلْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَ الْقَمِيْصِ وَ الْعِمَامَةِ, مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (أبوداود ٣٥٣/٤, صحيح الجامع رقم الحديث ٢٧٧٠).

অর্থঃ "লুঙ্গি, জামা ও পাগড়ীতে ইসবাল (ঝুলিয়ে পরা) রয়েছে। এগুলির মধ্য হতে যে কোন একটিকে কোন ব্যক্তি অহংকারের সাথে টেনে- ছেছড়ে নিয়ে বেড়ালে ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ তার প্রতি (রহমতের দৃষ্টিতে) দেখবেন না" (আবূদাউদ ৪/৩৫৩, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ২৭৭০)।

স্ত্রীলোকদের জন্য পায়ের সতরের সুবিধার্থে ১ বিঘত কিংবা ১ হাত পরিমাণ ঝুলিয়ে দেওয়ার সুযোগ আছে। কেননা বাতাস বা অন্য কোন কারণে সতর খোলার ভয় থাকলে অতিরিক্ত কাপড় দ্বারা সেটা সহজেই সামাল দেওয়া যায়। তবে সীমালংঘন করা তাদের জন্যেও জায়েয হবে না। যেমন বিয়ে শাদীতে পরিহিত কাপড়-চোপড়ের ক্ষেত্রে অনেক মেয়েদের সীমালংঘন করতে দেখা যায়। সেগুলি নির্ধারিত পরিমাণ থেকে কয়েক বিঘত এমনকি কয়েক হাতও লম্বা দেখা যায়। আর অনেক সময় পেছন থেকে তা অন্য কাউকে বয়ে নিয়ে যেতেও দেখা যায়।

৫৬. দাড়ি মুণ্ডানো (حَلْقُ اللِّحْيَ)

প্রশ্নঃ দাড়ি মুণ্ডানো অথবা চাঁছা ও ছাঁটা সম্পর্কে ইসলামী বিধান কি? ইসলামী শরী'আতে দাড়ি রাখার সীমা কতটুকু ?

উত্তরঃ ইসলামী শরী'আতে দাড়ি মুণ্ডানো হারাম। কেননা দাড়ি মুণ্ডানো হলো রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর নির্দেশ অমান্য করা। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন, "اَعْفُوْا اللُّحَي وَحَفُّوْا الشَّوَارِبَ" অর্থঃ তোমরা দাড়ি লম্বা করো আর গোঁফ ছোট কর"। আর একজন মুসলমান দাড়ি মুণ্ডানোর মাধ্যমে নবী ও রাসূলগণের আদর্শ ছেড়ে দিয়ে কাফির, মুশরিক, ইয়াহুদী ও নাছারাদের আদর্শ গ্রহণের প্রতি ধাবিত হয় যেটা পরিষ্কার হারাম। দাড়ি রাখার সীমা নির্ধারণ সম্পর্কে অভিধানে বলা হয়েছে মুখমণ্ডলের দুই গাল ও দুই চোয়ালের উপর গজানো লোমই হচ্ছে দাড়ি। অর্থাৎ দুই চোয়াল ও থুতনিতে গজানো সমস্ত পশমই হচ্ছে দাড়ি। তা থেকে কিছু কেটে ছেঁটে রাখাও রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর সুন্নাতের খেলাফ। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

* দাড়ি ছেড়ে দাও ... ... اَعْفُوْا اللُّحَى
* দাড়ি বড় কর ... ... وَأَرْخُوْا اللُّحَى
* বেশী করে দাড়ি রাখ ... ... وَوَفِّرُوْا اللُّحَى
* দাড়ি পরিপূর্ণ কর ... ... وَأَوْفُوْا اللُّحَى

এ সমস্ত হাদীছ প্রমাণ বহন করে যে, দাড়ি মুণ্ডানো এবং দাড়ি কেটে-ছেঁটে ছোট করে রাখা জায়েয নয়। তবে পাপের দিক থেকে দাড়ি মুণ্ডানো ও কেটে-ছেঁটে ছোট করে রাখার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। তা হলোঃ দাড়ি কেটে-ছেঁটে ছোট করে রাখার চেয়ে দাড়ি মুণ্ডানো বড় ধরনের অপরাধ। তবে দাড়ি কেটে-ছেঁটে ছোট করে রাখাও বড় অপরাধ। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,...

অর্থঃ "তোমরা গোঁফ কেটে ছোট করে, আর দাড়ি বড় করে অগ্নিপূজকদের আদর্শের বিরোধিতা কর।" (মুসলিম)

মেয়েরা কোন এক মহিলাকে জিজ্ঞেস করল যে, তুমি দাড়িওয়ালা স্বামী কেন পছন্দ করলে? প্রতি উত্তরে সে বলল, আমি তো একজন পুরুষ মুসলমানকে বিয়ে করেছি– কোন মেয়েকে বা কোন ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান ও অগ্নিপূজককে তো বিবাহ করিনি।

অনেক ভাই স্ত্রীর অপছন্দের কারণে দাড়ি রাখেন না। আপনিও যদি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত না হন, তাহ'লে আপনি আপনার স্ত্রীকে বলুন,! আমি একজন মুসলমান পুরুষ! আমি দুনিয়ার কাউকে খুশী করতে যেয়ে আমি আমার মহান প্রতিপালকের অবাধ্য হতে পারি না। এরপর আপনি আপনার স্ত্রীকে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর এ হাদীছ খানা শুনিয়ে দিন।"لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ"

অর্থঃ "স্রষ্টার নাফরমানী বা অবাধ্য হয়ে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।" (আহমাদ)

উপরের সমস্ত আলোচনার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হলো যে, লম্বা দাড়ি রাখা এবং কেটে-ছেঁটে ছোট না করা মহান আল্লাহ ও

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর নির্দেশ তথা ওয়াজিব। অপরদিকে দাড়ি না রাখা বা দাড়ি কামানো হারাম এবং ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান, অগ্নিপূজক ও মহিলাদের সাথে সাদৃশ্যতুল্য। এছাড়া দাড়ি রাখার ফলে একজন পুরুষের মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় আর পুরুষত্বের বিকাশ ঘটে। অতএব মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে দাড়ি রাখার মত ওয়াজিব কাজগুলি যথাযথভাবে পালন করার পূর্ণ তাওফীক্ব দান করুন আমীন।

*** মুফতী, শায়েখ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উসাইমিন (রাহিমাহুল্লাহ)।

৫৭. পুরুষদের স্বর্ণালংকার ব্যবহার করা

(تَحَلِّيُ الرِّجَالِ بِالذَّهَبِ عَلَى أَيِّ صُوْرَةٍ كَانَتْ)

আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন,

"أُحِلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِيْ اَلْحَرِيْرُ وَالذَّهَبُ وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُوْرِهَا" (أحمد ٤/٣٩٣، صحيح الجامع رقم الحديث ٢٠٧).

অর্থঃ "আমার উম্মাতের মধ্য হ'তে নারীদের জন্য রেশমী পোশাক এবং স্বর্ণ হালাল করা হয়েছে আর ঐ দু'টি জিনিস পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে" (আহমাদ ৪/৩৯৩, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ২০৭)। আজকাল বাজারে পুরুষদের জন্য স্বর্ণের তৈরী বিভিন্ন ডিজাইনের ঘড়ি, চশমা, কলম, চেইন, বোতাম, মেডেল ইত্যাদি পাওয়া যায়। এগুলির মধ্য হ'তে অনেকই সম্পূর্ণ স্বর্ণের তৈরী আর অনেকই স্বর্ণের প্রলেপযুক্ত।

অনেক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার হিসাবে পুরুষদেরকে এ ধরনের স্বর্ণের বিভিন্ন বস্তু দেওয়া হয়। এগুলি পরিষ্কার অন্যায় এতে কোন সন্দেহ নেই।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখতে পেয়ে তা খুলে নিয়েছিলেন এবং তা ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি বলেছিলেন,

"يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِّنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ" (مسلم ٣/١٦٥٥).

অর্থঃ "তামাদের কেউ কি ইচ্ছে করে যে, সে আগুনের অঙ্গার তুলে নিয়ে নিজের হাতে রাখতে পারে? রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম) সেখান থেকে উঠে চলে যাওয়ার পরে কোন এক ব্যক্তি ঐ লোকটিকে বলল, তোমার আংটিটা তুমি তুলে নাও, আর তা অন্য কাজে লাগাইও। তখন লোকটি একথা শুনে বলল, আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে জিনিস ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন– আমি সেই জিনিস কখনোই আর গ্রহণ করব না" (মুসলিম ৩/১৬৫৫)।

৫৮. মহিলাদের খাটো, পাতলা ও টাইট ফিট পোষাক পরিধান করা

(لُبْسُ الْقَصِيْرِ وَالرَّقِيْقِ وَالضَّيِّقِ مِنَ الثِّيَابِ لِلنِّسَاءِ)

বর্তমানে আমাদের শত্রুরা যে সমস্ত জিনিস দ্বারা আমাদের ঈমান-আমান নষ্ট করার জন্য এবং আমাদের আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে

একটি হলো, তাদের উদ্ভাবিত ও তৈরীকৃত বিভিন্ন ধরণের ডিজাইনের পোশাক-পরিচ্ছদ। যার সাহায্যে তারা মুসলমানদের চরিত্র ধ্বংসের জন্য কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ঐ সমস্ত কাফের, মুশরিক, ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের দেশ হ'তে আমদানিকৃত ডিজাইনের পোশাকগুলির কতক খুবই খাট মাপের, কতক খুবই আঁটসাঁট অর্থাৎ টাইট-ফিট করে তৈরী, আবার কতক এত পাতলা যে তা দিয়ে শরীরের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখা যায়। ফলে পোশাক পরার যে আসল লক্ষ্য সতর ঢাকা– সে সতর ঢাকা আর পূর্ণাঙ্গভাবে হয়ে উঠে না। এসব পোশাকের অনেক ডিজাইন পরিধান করা মোটেও জায়েয নয়। এমনকি মহিলাদের মাঝে এবং মাহরাম পুরুষদের মাঝেও এসব ডিজাইনের পোশাক পরা জায়েয নয়। এধরনের আপত্তিকর বা হারাম পোশাক পরিধান করার ভয়াবহতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

(صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَّعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُؤُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَيَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَ إِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَّسِيْرَةِ كَذَا وَ كَذَا) (مسلم ٣/١٦٨٠).

অর্থঃ "দুই শ্রেণীর জাহান্নামীকে আমি দেখিনি। প্রথম শ্রেণী– যাদের হাতে থাকবে গরুর লেজের মত ছড়ি, তা দ্বারা তারা লোকদেরকে প্রহার করবে। দ্বিতীয় শ্রেণী– ঐ সকল রমণী, যারা বস্ত্র পরিহিতা অথচ উলঙ্গ, নেকাব বিহীনা, প্রেম-ভালবাসা স্থাপনকারিণী। তাদের মাথা হবে লম্বা ঘাড়বিশিষ্ট উটের চুঁটির মত। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না আর তারা জান্নাতের

সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধ এত এত দূর থেকেও অর্থাৎ বহুদূর থেকেও পাওয়া যাবে" (মুসলিম ৩/১৬৮০)।

যে সকল মহিলা নীচের দিকে বা অন্যান্য দিকে দীর্ঘ ফাড়া পোশাক পরিধান করে তারাও উক্ত হাদীছের বিধানভুক্ত হবে। এগুলি পরে বসলে তাদের সতরের অংশবিশেষ প্রকাশ হয়ে যায়। এতে সতর প্রকাশের পাশাপাশি কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য, তাদের কৃষ্টি-কালচারের অন্ধ অনুকরণ ও তাদের উদ্ভাবিত অশালীন পোশাকের অনুসরণ করা হয়।

কোন কোন পোশাকে আবার অশালীন ছবি অঙ্কিত থাকে। যেমন গায়কদের ছবি, বাদক দলের ছবি, মদপাত্রের ছবি, প্রাণীর ছবি, ক্রুশের ছবি, অবৈধ সভা-সমিতি ও ক্লাবের ছবি ইত্যাদি। আর অনেক পোশাকে মান-ইয্যত নষ্টকারী কথাও লেখা থাকে। অনেক সময় বিদেশী ভাষাতেও এসব লেখা দেখা যায়। এ জাতীয় পোশাক পরিহার করা অবশ্যই কর্তব্য।

৫৯. পরচুলা ব্যবহার করা

(وَصْلُ الشَّعْرِ بِشَعْرٍ مُسْتَعَارٍ لِآدَمِيٍّ وَلِغَيْرِهِ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ)

যাদের টাক কিংবা পাতলা চুল রয়েছে তারা লোক লজ্জার কারণে কিংবা নিজেকে অল্প বয়সী হিসাবে প্রকাশ করার জন্য মাথায় পরচুলা (অর্থাৎ অন্য মানুষের চুল অথবা বিকল্পভাবে তৈরী করা চুল) ব্যবহার করে থাকে। আর এই পরচুলা অন্য মানুষের মাথার চুল থেকেও তৈরী হয় আবার বিভিন্ন পদ্ধতিতেও তৈরী করা হয়। উভয় প্রকার পরচুলাই ব্যবহার করা হারাম। এই পরচুলা ব্যবহার করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে ২ টি হাদীছ নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

"عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ جَاءَتْ إِمْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِيْ ابْنَةً عَرِيْسًا أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا أَفَأَصِلُهُ فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَ الْمُسْتَوْصِلَةَ" (مسلم ٣/١٦٧٦).

অর্থঃ "আসমা বিনতে আবূ-বাকর (রাঃ) বলেন, কোন এক মহিলা নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকটে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার একটি সদ্য বিবাহিতা কন্যা আছে। হাম হওয়ার কারণে তার মাথার চুল পড়ে গেছে। আমি কি তাকে পরচুলা লাগিয়ে দিব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, যে পরচুলা নিজে লাগায় এবং অন্যকে লাগিয়ে দেয় আল্লাহ তাদের উভয়কে অভিশাপ দিয়েছেন" (মুসলিম ৩/১৬৭৬)। এ প্রসঙ্গে জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا"(مسلم ٣/١٦٧٩).

অর্থঃ "নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিলাদের মাথায় চুল বা অন্য কিছু সংযোজন করার জন্য ধমক দিয়েছেন" (মুসলিম ৩/১৬৭৯).

৬০. পোশাক পরিচ্ছদে, কথা-বার্তায় ও বেশ-ভূষায় নারী-পুরুষ একে অপরের বেশ ধারণ করা

(تَشَبُّهُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالنِّسَاءِ بِالرِّجَالِ)

পুরুষকে আল্লাহ তা'আলা যে পুরুষত্ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তাকে তা বজায় রাখা, এমনিভাবে নারীদেরকে যে নারীত্ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তাকে তা ধরে রাখাই আল্লাহর বিধান। এটা এমনি এক ব্যবস্থা, যা না হ'লে মানব জীবন বিগড়ে যাবে। পুরুষদের নারীর বেশ ধারণ আর নারীদের পুরুষের বেশ ধারণ স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ। এর ফলে অশান্তির দুয়ার খুলে যায় আর সমাজে ফিৎনা-ফাসাদ ও বেহায়াপনার বিস্তার ঘটে। ইসলামী শরী'আতে এ জাতীয় কাজকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। কোন ব্যক্তি যে আমল করার কারণে শারঈ দলীলে তাকে অভিশাপ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে– সেই দলীলই প্রমাণ করে যে, উক্ত কাজ হারাম ও কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। এ কাজের ভয়াবহতা সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে,

"لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ" (بخاري , فتح الباري ٣٣٢/١٠).

অর্থঃ "রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুরুষদের মধ্যে নারীর বেশ ধারণকারীদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন" (বুখারী, ফাতহুল বারী ১০/৩৩২)। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে আরো বর্ণিত আছে,

"لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ" (فتح الباري ٣٣٣/١٠).

অর্থঃ "রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারীদের বেশ ধারণকারী পুরুষদেরকে আর পুরুষদের বেশ ধারণকারী নারীদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন" (বুখারী, ফাতহুল বারী

১০/৩৩৩)। এই অনুকরণ উঠা-বসা, চলা-ফেরা, কথা-বার্তা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে হয়ে থাকে। যেমন দৈহিকভাবে মেয়েলী বেশ ধারণ করা, কথাবার্তা ও চলাফেরায় মেয়েলীপনা অবলম্বন করা কিংবা পুরুষের বেশ ধারণ করা ইত্যাদি।

পোশাক ও অলংকার পরিধানেও অনুকরণ রয়েছে। সুতরাং পুরুষের জন্য গলার হার, হাতের চুড়ি, পায়ের মল, কানের দুল পরা চলবে না। অনুরূপভাবে মহিলারাও পুরুষদের জামা, পাজামা, প্যান্ট, শার্ট, পানজাবী পরতে পারবে না। এছাড়া নারীদের পোশাকের ডিজাইন পুরুষদের পোশাকের ডিজাইন থেকে অন্য রকম হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"لَعَنَ اللهُ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ" (أبو داود ٣٥٥/٤, صحيح الجامع رقم الحديث ٥٠٧١)

অর্থঃ "আল্লাহ তা'আলার লা'নত সেই পুরুষের উপর, যে মেয়েলী পোশাক পরিধান করে, এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার লা'নত সেই নারীর উপর, যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে" (আবূ-দাঊদ ৪/৩৫৫, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৫০৭১)। অতএব নারী পুরুষ উভয়ের মধ্য হ'তে কারো জন্যে কোন রকম বেশ বা পোশাক পরিচ্ছদ পরিবর্তন করা জায়েয হবে না।

৬১. পাকা চুলে কাল খেজাব ব্যবহার করা

(صَبْغُ الشَّعْرِ بِالسَّوْدَاءِ)

চুলকে কাল রঙে রঞ্জিত করা হারাম। হাদীছে কাল খেজাব সম্পর্কে যে হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে তাতে একথাই প্রমাণিত

হয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"يَكُوْنُ قَوْمٌ يَخْضَبُوْنَ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لاَ يُرِيْحُوْنَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ" (أبوداود ٤١٩/٤, صحيح الجامع رقم الحديث ٨١٥٣)

অর্থঃ "শেষ যামানায় একদল লোক কবুতরের বুকের রঙের ন্যায় কাল খেজাব ব্যবহার করবে। আর এ কারণেই তারা জান্নাতের কোন সুগন্ধি পাবে না" (আবূ-দাউদ ৪/৪১৯, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৮১৫৩)।

অনেক চুলপাকা ব্যক্তিকে এ কাজ করতে দেখা যায়। তারা কাল রঙ দ্বারা সাদা চুল রাঙিয়ে নিজেদেরকে যুবক কিংবা অপেক্ষাকৃত কম বয়সী বলে যাহির করে। এতে প্রতারণা, আল্লাহর সৃষ্টিকে গোপন করা ও মিথ্যা আত্মতৃপ্তি ছাড়া আর কিছুই হয়না। এরফলে ব্যক্তিগত চালচলনের উপর নিঃসন্দেহে এক প্রকার কুপ্রভাব পড়ে। আর অন্য মানুষ তাতে প্রতারিত হয়। নাবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাকা চুলে খেজাব লাগিয়েছিলেন মেহেন্দি বা এ ধরনের কোন জিনিস দ্বারা। যাতে হলুদ, লাল ইত্যাদি মৌলিক রঙ ফুটে ওঠে। তবে কাল রঙ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনোই খেজাব লাগান নাই।

আবূ-বাকর (রাঃ)-এর পিতা আবূ-কুহাফা (রাঃ)-কে মক্কা বিজয়ের দিন যখন রাসূলুল্লাহ এর সামনে হাযির করা হয় তখন তার চুল-দাড়ি এত সাদা হয়ে গিয়েছিল যে, তা সাগামা অর্থাৎ কাশ ফুলের ন্যায় ধবধবে দেখা যাচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে দেখে বলেছিলেন,

"غَيِّرُوْا هَذَا بِشَيْءٍ وَ اجْتَنِبُوْا السَّوَادَ" (مسلم ١٦٦٣/٣)

অর্থঃ "তোমরা কোন কিছু দ্বারা এটা পরিবর্তন করে দাও। তবে কাল রঙ থেকে বিরত থাকো" (মুসলিম ৩/১৬৬৩)। এমনিভাবে নারীদের চুলে খেজাব ব্যবহার করার বিধান পুরুষদের চুলে খেজাব ব্যবহার করার মতই। তারাও পাকা চুলকে কাল রঙে রাঙাতে পারবে না।

৬২. কাপড়, দেওয়াল ও কাগজ ইত্যাদিতে কোন প্রাণীর ছবি অংকণ করা

(تَصْوِيْرُ مَا فِيْهِ رُوْحٌ فِيْ الثِّيَابِ وَالْجُدْرَانِ وَالْوَرَقِ وَنَحْوَ ذَلِكَ)

আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন,

"إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ" (بخاري, فتح الباري ٣٨٠/١٠)

অর্থঃ "নিশ্চয়ই ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহর বিচারে কঠোর শাস্তি প্রাপ্তরা হবে ছবি অংকণকারীগণ" (বুখারী, ফাতহুল বারী ১০/৩৮২)। আবূ-হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

"وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِيْ فَلْيَخْلُقُوْا حَبَّةً وَلِيَخْلُقُوْا ذَرَّةً"

(بخاري, فتح الباري ٣٨٥/١٠).

অর্থঃ 'যারা আমার সৃষ্টির ন্যায় কোন কিছু সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে তাদের থেকে বড় যালেম আর কে হ'তে পারে? তারা যদি এই সৃষ্টির ব্যাপারে এতই ক্ষমতা রাখে– তাহ'লে তারা একটা শস্য দানা সৃষ্টি করুক কিংবা একটা ক্ষুদ্রবস্তু বা একটা ছোট

পিঁপড়া সৃষ্টি করুক" (বুখারী, ফাতহুল বারী ১০/৩৮৫)। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেছেন,

"كُلُّ مُصَوِّرٍ فِيْ النَّارِ ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُ فِيْ جَهَنَّمَ" (مسلم ٣/١٦٧١).

অর্থঃ "প্রত্যেক ছবি নির্মাতা জাহান্নামে যাবে। সে যত ছবি অংকণ করেছে তার প্রত্যেকটির স্থলে তার জন্য একটি করে প্রাণী তৈরী করা হবে। আর সেই প্রাণী তাকে জাহান্নামে শাস্তি দিবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,"তোমাদেরকে যদি একান্ত প্রয়োজনে ছবি আঁকতেই হয় তাহলে বৃক্ষ বা গাছ-পালা ও যে বস্তুর রূহ নেই তার ছবি আঁক" (মুসলিম ৩/১৬৭১)।

এ সকল হাদীছ হ'তে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মানুষ ও প্রাণী তথা জীব-জানোয়ারের ছবি আঁকা হারাম- তা কাপড়ে, কাগজে বা অন্য কিছুতে ছাপা হৌক, কিংবা খোদাইকৃত হৌক, কিংবা অংকিত হৌক, কিংবা ছাঁচে ঢালাই করা হৌক। কেননা ছবি হারাম সংক্রান্ত হাদীছের আওতায় এ সবই পড়ে। আর যে ব্যক্তি মুসলমান সে তো ইসলামী শরী'আতের কথা দ্বিধাহীনচিত্তে মেনে নিবে। সে এ বিতর্ক করতে যাবে না যে, আমি তো তার পূজা করি না বা উহাকে সিজদা করিনা। একজন জ্ঞানী মানুষ যদি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বর্তমান যুগে ব্যাপক বিস্তার লাভকারী ছবির মধ্যে নিহিত একটি ক্ষতির কথাও চিন্তা করেন- তাহ'লে ইসলামী শরী'আতে ছবি হারাম হওয়ার তাৎপর্য তিনি সহজেই বুঝতে পারবেন। বর্তমানে এমন অনেক ছবি আছে যার কারণে মানুষের কুপ্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে, ফলে অবৈধ লোভ-লালসা ও কামনার জোয়ার সৃষ্টি হয়। আর এ সমস্ত উলংগ ও বেহায়া ছবির কারণেই সমাজে যিনা-ব্যভিচারের ছয়লাব বয়ে চলেছে।

এ ছাড়া একজন মুসলমানের ঘরে কোন প্রাণীর ছবি রাখা কোন প্রকারেই ঠিক হবে না। কেননা যে ঘরে কোন প্রাণীর ছবি থাকে সে ঘরে আল্লাহর কোন ফিরিশতা প্রবেশ করে না। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيْرُ" (بخاري، فتح الباري ١٠/٣٨٠).

অর্থঃ "যে বাড়ীতে কুকুর এবং কোন প্রাণীর ছবি থাকে সেই বাড়ীতে কোন ফেরেশতা প্রবেশ করে না" (বুখারী, ফাতহুল বারী ১০/৩৮০)।

কোন কোন বাড়ীতে কাফির ও মুশরিকদের দেব-দেবীর ছবি দেখতে পাওয়া যায়। বলা হয় যে, এ গুলি আমরা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য রেখেছি। অন্যান্য ছবির তুলনায় এগুলি আরো বড় ধরনের হারাম। এমনিভাবে দেওয়ালের গায়ে টাঙানো বা ঝুলানো ছবিও বড় ধরনের হারামের ভিতর গণ্য। এ সমস্ত ছবি কত যে সম্মান পায়, মানুষের কত যে দুঃখ তাজা করে, আর কত যে গর্ব বয়ে আনে তা একবার ভেবে দেখার প্রয়োজন।

ছবিকে কখনো 'স্মৃতি' বলা যায় না। কেননা একজন মুসলিম আত্মীয় ও প্রিয়জনের 'স্মৃতি' তো নিজের অন্তরে বিরাজ করে। একজন মুসলমান তাদের জন্য রাব্বুল আলামীনের নিকটে রহমত ও মাগফেরাতের দু'আ করবে। তাতেই তাদের স্মৃতি জাগরুক থাকবে।

সুতরাং সর্বপ্রকার প্রাণীর ছবি বাড়ী থেকে সরিয়ে দেওয়া ও নিশ্চিহ্ন করে ফেলা আবশ্যক। তবে হাঁ, যেগুলি নিশ্চিহ্ন করা কষ্টকর ও অসাধ্য সেগুলি ব্যতিক্রম বলে গণ্য হবে। যেমন সাধারণভাবে প্রচলিত নানা ধরনের বস্তুতে অঙ্কিত ছবি, যেমন

অভিধান, রেফারেন্স বুক ও অন্যান্য পাঠ্য বইয়ের ছবি ইত্যাদি। তবে যথা সম্ভব সে গুলি দূর করা সম্ভব হলে দূর করার চেষ্টা করা উচিত। বিশেষ করে কোন প্রকারেই খারাপ ছবি ও নারী-পুরুষের বেপর্দা অবস্থায় উঠানো ছবি কোন ক্রমেই রাখা ঠিক হবে না। তবে পরিচয়পত্রে, পাসপোর্টে ব্যবহৃত ছবি হারামের আওতাভুক্ত হবে না। কেননা দেশে বা বিদেশে তার প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। তবে যে সব ছবির সম্মান করা হয় না, বরং তা পদদলিত করার ন্যায় গণ্য, সে সব ছবি প্রয়োজনের তাকিদে অংকণ করার অবকাশ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ অর্থঃ "তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর" (তাগাবুন,১৬)।

৬৩. মানুষের নিকট মিথ্যা স্বপ্ন বলা

(اَلْكِذْبُ فِي الْمَنَامِ)

মানুষের মাঝে মর্যাদার আসন লাভ করা, আলোচনার পাত্র হওয়া, কোন আর্থিক সুবিধা লাভ করা, কিংবা কোন শত্রুকে ভয় দেখানো এ ধরনের বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মিথ্যা স্বপ্ন বলার অভ্যাস সমাজে কিছু কিছু মানুষের ভিতর দেখা যায়। আর জনসাধারণের মধ্য হতে যারা ধর্মীয় ব্যাপারে মূর্খ তাদের অনেকেই এ ধরনের স্বপ্নকে বিশ্বাস করে এবং খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। স্বপ্নের সাথে তাদের সম্পর্ক খুবই গভীর। তারা এ ধরনের স্বপ্নকে বাস্তব মনে করে। যার ফলে এ ধরনের মিথ্যা স্বপ্নের দ্বারা তারা প্রতারিত হয়। আর যে ব্যক্তি সমাজে এ ভাবে মিথ্যা স্বপ্ন বলে বেড়ায় তার জন্য হাদীছে কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ أَوْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَالَمْ تَرَ، وَيَقُوْلُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَمْ يَقُلْ" (بخاري, فتح الباري ٦/٥٤٠).

অর্থঃ "সবচেয়ে বড় মনগড়া বা মিথ্যার মধ্যে রয়েছে ঐ ব্যক্তি, যে নিজেকে নিজের আপন পিতা ব্যতীত অন্যের সন্তান হিসাবে আখ্যায়িত করে বা দাবী করে, আর যে স্বপ্ন সে দেখেনি- সে তা দেখার দাবী করে আর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলেননি তাঁর নামে তা বলে বেড়ায়" (বুখারী, ফাতহুল বারী ৬/৫৪০)। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেছেন,

"مَنْ تَحَلَّمَ بِحِلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيْرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ" (بخاري, فتح الباري ١٢/ ٤٢٧). অর্থঃ "যে ব্যক্তি স্বপ্নে যা দেখেনি অথচ সে তা দেখার ভান করে বা দাবী করে- তাহ'লে তাকে দু'টি চুলে গিরা দিতে বাধ্য করা হবে। কিন্তু সে তা কখনই করতে পারবে না" (বুখারী, ফাতহুল বারী ১২/৪২৭)। অতএব এ হাদীছের দ্বারা এটাই প্রমাণিত হলো যে, দু'টি চুলে গিরা দেওয়া যেমন অসাধ্য কাজ, তেমন বলা যেতে পারে যে, কাজ যেমন হবে তার ফলাফলও তেমন হবে।

৬৪. কবরের উপর বসা, কবর পদদলিত করা এবং কবরস্থানে পেশাব-পায়খানা করা

(اَلْجُلُوْسُ عَلَى الْقَبْرِ وَالْوَطْءُ عَلَيْهِ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي الْمَقَابِرِ)

আবূ-হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ" (مسلم ٢/٦٦٧).

অর্থঃ "যদি তোমাদের কারো আগুনের অঙ্গারের উপর বসার দরুন তার কাপড় পুড়ে দেহের চামড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায় তবুও তা তার জন্য কবরের উপর বসা থেকে উত্তম" (মুসলিম ২/৬৬৭)।

সমাজের অনেকেই কবরের উপর দিয়ে যাতায়াত করে থাকে। তারা যখন নিজেদের কাউকে দাফন করার জন্য কবরস্থানে নিয়ে আসে, তখন দেখা যায় তারা পার্শ্ববর্তী কবরগুলির উপর দিয়ে চলাচল করছে, কখনও আবার তারা জুতা পায়ে দিয়ে কবরের উপর চলাফেরা করছে, এ সমস্ত বিষয়ে তারা কোন খেয়ালই করে না। অন্যান্য মৃত ব্যক্তিদের কোন ক্বদরই যেন তাদের কাছে নেই। অথচ ঐ সমস্ত মৃত ব্যক্তিদের সম্মানের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ" (ابن ماجة ٤٩٩/١ , صحيح الجامع رقم الحديث ٥٠٣٨).

অর্থঃ "আগুনের অঙ্গার কিংবা তরবারীর উপর দিয়ে আমার হেঁটে যাওয়া কিংবা আমার পায়ের চামড়া দ্বারা আমার পায়ের চটি তৈরী করা একজন মুসলমানের কবরের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া থেকে আমার নিকট অধিক প্রিয়" (ইবনু মাজাহ ১/৪৯৯, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৫০৩৮)।

অতএব যে ব্যক্তি কোন কবরস্থানের মালিক হয়ে সেখানে ব্যবসা কেন্দ্র কিংবা বাড়ী-ঘর গড়ে তোলে তার অবস্থা কি হবে?

আর কিছু লোক কবরস্থানে পেশাব-পায়খানা করে থাকে। তাদের যখন পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন দেখা দেয় তখন তারা কবরস্থানের প্রাচীর টপকিয়ে কিংবা খোলা স্থান দিয়ে ঢুকে পড়ে... পরিশেষে তারা পেশাব-পায়খানার নাপাকী ও দুর্গন্ধ দ্বারা মৃতদের কষ্ট দেয়। কবরের উপরে পেশাব-পায়খানা করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"وَمَا أُبَالِي أَوْسَطَ الْقَبْرِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسَطَ السُّوْقِ" (ابن ماجة ٤٩٩/١).

অর্থঃ "আমি কবরস্থানের মাঝে পেশাব-পায়খানা করতে পারলে বাজারের মধ্যস্থলে পেশাব-পায়খানা করার ব্যাপারে কোন পরোয়া করিনা" (ইবনু মাজাহ ১/৪৯৯)। অর্থাৎ কবরস্থানে পেশাব-পায়খানা করার ঘৃণিত পাপ আর বাজারের মধ্যে হাজারো জনগণের সামনে সতর খোলা আর পেশাব-পায়খানা করার ঘৃণিত পাপের পরিমাণ একই সমান। সুতরাং কবরস্থানে মল-মুত্র ত্যাগ করা গুনাহ তো বটেই, এমনকি তা লোকালয়ে মল-মুত্র ত্যাগের ন্যায় লজ্জাকরও বটে। আর যারা ইচ্ছাকরে কবরস্থানে ময়লা-আবর্জনা ও গোবর ইত্যাদি জিনিস ফেলে তারাও এই পাপের অধিকারী হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। অতএব এ সমস্ত ঘৃণিত ও পাপের কাজ হ'তে দূরে থাকার তাওফীক আল্লাহ আমাদেরকে দান করুন। আমীন।

৬৫. পেশাব থেকে অসতর্ক থাকা

(عَدَمُ الْإِسْتِتَارِ مِنَ الْبَوْلِ)

মানব সমাজকে সার্বিকভাবে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য যত উপায়-উপকরণ আছে ইসলামী শরী'আত সে সবের বিস্তারিতভাবে বর্ণনা বা নির্দেশনা দিয়েছে। এটি ইসলামী শরী'আতের একটি বড় সৌন্দর্যের দিক। নাপাকী দূর করার পদ্ধতি এসব উপায়ের অন্যতম একটি। আর এ কারণেই 'ইসতিনজা' বা শৌচকার্যের বিধান নির্ধারণ করা হয়েছে আর কিভাবে তার পাক-পবিত্রতা অর্জন করা যাবে তার নিয়ম-কানুনও বলে দেওয়া হয়েছে।

অনেকে নাপাকী দূর করার ব্যাপারে অনেক অলসতা করে থাকে। যার ফলে তাদের কাপড় ও দেহ অপবিত্র হয়ে যায়– যার ফলে তাদের নামায সঠিকভাবে আদায় হয় না। আর নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটাকেই কবর আযাবের অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনু-আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনার একটি খেজুরের বাগানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেখানে তিনি দু'জন মৃত ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনতে পান। ক্ববরে তাদের শাস্তি হচ্ছিল। তা শুনে তিনি বললেন, এ দু'টো লোককে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বড় কোন কারণে নয়। অবশ্য গুনাহ হিসাবে এগুলি কাবীরা। তাদের একজন পেশাব শেষে ভাল করে পবিত্র হ'ত না, আর দ্বিতীয়জন চোগলখুরী করে বেড়াত" (বুখারী, ফাতহুল বারী ১/৩১৭)। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথাও বলেছেন যে,

"أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ" (أحمد ٢/٣٢٦, صحيح الجامع رقم الحديث ١٢١٣).

অর্থঃ "বেশীরভাগ কবরের আযাব পেশাবের কারণেই হয়" (আহমাদ ২/৩২৬, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ১২১৩)। পেশাবের ফোঁটা বন্ধ না হ'তেই যে দ্রুত পেশাব হ'তে উঠে পড়ে কিংবা এমন কায়দায় বা স্থানে পেশাব করে যেখান থেকে পেশাবের ছিটা এসে গায়ে বা কাপড়ে লাগে সেও এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কাফেরদের দেখাদেখি আমাদের মধ্যে অনেক স্থানেই দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে বা লাগিয়ে টয়লেট তৈরী করা হয়। এগুলি অনেক সময় খোলা-মেলা জায়গায়ও দেখা যায়। মানুষ কোন লজ্জা-শরম না করেই চলাচলকারী মানুষদের সামনে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে শুরু করে। তারপর পেশাবের নাপাকী ধৌত না করে ঐ নাপাকীসহই কাপড় পরে নেয়। এর ফলে দু'টি বড় ধরনের হারাম কাজ একত্রিত হয়। ১. সে তার লজ্জাস্থানকে মানুষের দৃষ্টি থেকে হেফাযত করল না। ২. সে পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করল না।

৬৬. লোকদের অপছন্দ করা সত্ত্বেও গোপনে তাদের আলাপ-আলোচনা শ্রবণ করা

(التَّسَمُّعُ إِلَى حَدِيْثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ)

উল্লিখিত বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَجَسَّسُوْا...﴾

অর্থঃ "তোমরা গোয়েন্দাগিরি করনা" (হুজুরাত,১২)। এ প্রসঙ্গে ইবনু-আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম) বলেছেন,

"مَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيْثِ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (طبراني, كبير ١١/٢٤٨-٢٤٩,صحيح الجامع رقم الحديث ٦٠٠٤).

অর্থঃ "যে ব্যক্তি লোকদের অনীহা বা অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে, এ কারণে ক্বিয়ামতের দিন তার দু'কানে গলিত সীসা ঢেলে দেওয়া হবে" (ত্বাবারানী, কবীর ১১/২৪৮-২৪৯, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৬০০৪)। আর যদি ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তাদের থেকে শোনা কথা তাদের অগোচরে মানুষের নিকট বলে বেড়ায় তাহ'লে গোয়েন্দাগিরির পাপের সাথে কুটনামের পাপও জড়িত হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ" অর্থঃ "যে লোকদের অগোচরে তাদের কথা শোনে এবং অন্যত্র কুটনাম বা দুর্নাম করে বেড়ায় এ পাপের কারণে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না" (বুখারী, ফাতহুল বারী ১০/৪৭২)।

৬৭. অসৎ প্রতিবেশী

(سُوْءُ الْجِوَارِ)

প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের প্রতি জোর তাকিদ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَاعْبُدُوْا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا﴾ (النساء:٣٦)

অর্থঃ "তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, এবং তাঁর সাথে আর কাউকে অংশীস্থাপন করো না আর তোমরা মাতা-পিতার সাথে ভাল ব্যবহার কর। আর ভাল ব্যবহার কর নিকটাত্মীয়, য়াতীম, মিসকিন বা গরীব, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, পার্শ্বে অবস্থানরত সঙ্গী ও পথিকদের সঙ্গে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভালবাসেন না যারা গর্ব করে ও অহংকার করে বেড়ায়" (আন-নিসা,৩২)।

প্রতিবেশীর হক্ব অতীব গুরুত্বপূর্ণ, আর এ কারণেই তাকে কোন প্রকার কষ্ট দেওয়া ইসলামী শরী'আতে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আবূ শু'আইব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللهِ لَايُؤْمِنُ وَاللهِ لَايُؤْمِنُ قِيْلَ وَمَنْ يَارَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ الَّذِيْ لَايَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ" (بخاري, فتح الباري ١٠/٤٤٣).

অর্থঃ "আল্লাহর শপথ সে মু'মিন নয়, আল্লাহর শপথ সে মু'মিন নয়, আল্লাহর শপথ সে মু'মিন নয়। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সেই ব্যক্তি? উত্তরে তিনি বললেন, যার প্রতিবেশী তার অত্যাচার হ'তে নিরাপদে থাকতে পারে না" (বুখারী, ফাতহুল বারী ১০/৪৪৩)।

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম) এক প্রতিবেশী কর্তৃক অন্য প্রতিবেশীর সুখ্যাতি ও নিন্দা করাকে ভাল ও মন্দ আচরণের মাপকাঠি হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইবনু মাসউদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি ভাল আচরণ করলাম না মন্দ আচরণ করলাম তা কী করে বুঝব? তার উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

"إِذَا سَمِعْتَ جِيْرَانَكَ يَقُوْلُوْنَ قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُوْلُوْنَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ" (أحمد ١/٤٠٢, صحيح الجامع رقم الحديث ٦٢٣).

অর্থঃ "যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীদেরকে বলতে শুনবে যে, তারা তোমার সম্পর্কে পরস্পর বলাবলি করছে যে- "তুমি ভাল আচরণ কর" (তোমার ব্যবহার ভাল) তখন তুমি বুঝবে যে, "তুমি নিশ্চয়ই ভাল আচরণ করছ"। আর যখন তুমি তাদেরকে পরস্পর বলাবলি করতে শুনবে যে, "তুমি মন্দ আচরণ কর" অর্থাৎ তোমার ব্যবহার ভাল না, তখন তুমি বুঝবে যে, তুমি নিশ্চয়ই মন্দ আচরণ করছ"(আহমাদ ১/৪০২, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৬২৩)।

প্রতিবেশীর সাথে মন্দ আচরণ, খারাপ ব্যবহার বিভিন্নভাবে হ'তে পারে। যেমন প্রতিবেশীর সাথে যৌথভাবে নির্মিত বাড়ীর প্রাচীরের উপর কাঠ কিংবা বাঁশ রেখে কোন কাজ করতে বাধা দেওয়া, প্রতিবেশীর অনুমতি না নিয়ে তার বাড়ী হ'তে নিজ বাড়ীকে উঁচু বা বহুতল করে তার বাড়ীতে আলো-বাতাস চলাচলে বাধা সৃষ্টি করা, প্রতিবেশীর বাড়ী বরাবর জানালা তৈরী

করে তার বাড়ীর লোকদের সতর দেখতে চেষ্টা করা, বিরক্তিকর শব্দ দ্বারা তাকে কষ্ট দেওয়া, যেমন চেঁচামেচি ও খটখট আওয়াজ করা বিশেষ করে ঘুম ও আরামের সময়ে, প্রতিবেশীর ছেলে মেয়েদেরকে মার ধোর করা, কিংবা তার বাড়ীর দরজায় ময়লা অবর্জনা ফেলা ইত্যাদি।

এছাড়া প্রতিবেশীর কোন হক্ব অর্থাৎ তার নায্য অধিকার আদায় করার ব্যাপারে কোন রকম টাল-বাহানা করলে মানুষের পাপের পরিমাণ আরো বেড়ে যায়। নবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"لَأَنْ يَّزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَّزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ- لَأَنْ يَّسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَّسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ" (بخاري, الأداب المفرد رقم الحديث ١٠٣, سلسله صحيحه رقم الحديث ٦٥).

অর্থঃ "কোন ব্যক্তির পক্ষে অন্য ১০ জন মহিলার সঙ্গে যিনার কাজে লিপ্ত হওয়া নিজের প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে যিনার কাজে লিপ্ত হওয়ার তুলনায় অনেক হালকা। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তির পক্ষে অন্য কোন ১০ বাড়ীতে চুরি করা- নিজের প্রতিবেশীর বাড়ীতে চুরি করা অপেক্ষা অনেক হালকা" (বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ হাদীছ নং ১০৩, সিলসিলা ছহীহাহ হাদীছ নং ৬৫)।

ব্যভিচার ও চুরি উভয়ই অপরাধ। কারো সঙ্গেই তা বৈধ নয়। তা সত্ত্বেও প্রতিবেশীর বাড়ীতে যিনা-ব্যভিচার ও চুরি করা এতই বড় পাপের কাজ যে- অন্য ১০ বাড়ীতে যিনা-ব্যভিচার ও চুরি করার পাপ এর তুলনায় অনেক কম। অতএব প্রতিবেশীর

হক্ব নষ্ট করা যে কত বড় মারাত্মক অপরাধ সেটা এ থেকেই অতি সহজে অনুমান করা যায়।

অনেক অসাধু ব্যক্তি আছে, তারা প্রতিবেশীর অনুপস্থিতির সুযোগে রাতে তাদের গৃহে প্রবেশ করে এবং অপকর্মে লিপ্ত হয়। এসব লোকের জন্য এক বিভীষিকাময় তথা ক্বিয়ামত দিনের শাস্তি অপেক্ষা করছে।

৬৮. অছিয়ত দ্বারা কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা

(اَلْمُضَارَّةُ فِي الْوَصِيَّةِ)

ইসলামী শরী'আতের একটি অন্যতম নীতি হলো, 'নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হব না, আর অন্যেরও ক্ষতি করব না'। এ জাতীয় ক্ষতি করার একটি দৃষ্টান্ত হ'ল, শরী'আত স্বীকৃত ওয়ারিছগণের সবাইকে অথবা বিশেষ কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। কেউ এমনটি করলে সে নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম) প্রদত্ত হুঁশিয়ারীর আওতায় পড়বে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম) বলেছেন,

"وَمَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللهُ عَلَيْهِ"

অর্থঃ "যে কারো ক্ষতি করবে– এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করাবেন। আর যে কারো সাথে শত্রুতা ও বিরোধিতা করবে– এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে দুঃখে-কষ্টে ফেলবেন"(আহমাদ ৩/৪৫৩, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৬৩৪৮)। অছিয়তের মাধ্যমে মানুষ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পারে। যেমনঃ কোন ওয়ারিছকে তার ন্যায্য অংশ বা অধিকার হ'তে বঞ্চিত করা। অথবা একজন ওয়ারিছকে ইসলামী শরী'আত

যতটুকু নির্ধারণ করে রেখেছে তার বিপরীতে তার জন্য অছিয়ত করা কিংবা এক তৃতীয়াংশের বেশী অছিয়ত করা ইত্যাদি। যে সব দেশে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা চালু নেই সেখানে একজন পাওনাদার অনেক ক্ষেত্রেই মানব রচিত বিধানের কারণে তার শরী'আত নির্ধারিত অধিকার লাভে সমর্থ হয়না। মানব রচিত বিচার ব্যবস্থা তাকে উকিলের মাধ্যমে বঞ্চিত অছিয়ত কার্যকর করতে আদেশ দেয় আর সে তা বাস্তবায়ন করতে বাধ্য হয়। সুতরাং বড়ই পরিতাপ তাদের স্বহস্তে রচিত আইনের জন্য আর বড়ই পরিতাপ তারা যে পাপ কামাই করছে তার জন্য।

৬৯. তাস ও দাবা খেলা (اَللَّعِبُ بِالنَّرْدِ وَالْبَلُوْتِ)

লোক সমাজে অনেক খেলাধূলার সাথেই হারাম জড়িত আছে। দাবা খেলা ঐ সমস্ত হারাম খেলাধূলার মধ্য হতে অন্যতম। আর এই দাবা খেলার মাধ্যমে আরো অনেক রকম হারাম খেলার প্রতি ঝুঁকে পড়ে মানুষ। বিশেষ করে এই দাবা খেলার দ্বারা বিভিন্ন রকম জুয়া খেলার সূচনা হয়। আর এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দাবা খেলা সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন,

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شِيْرٍ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِيْ لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَدَمِهِ (مسلم ٤/ ١٧٧٠).

অর্থঃ "যে ব্যক্তি দাবা খেলল সে যেন শুকরের রক্ত-মাংসে নিজের হাত রঞ্জিত করল" (মুসলিম ৪/১৭৭০)। আবূ-মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَ رَسُوْلَهُ (احمد ٣٩٤/٤, صحيح الجامع ٦٥٠٥).

অর্থঃ "যে ব্যক্তি দাবা খেলে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানকে অমান্য করল" (আহমাদ ৪/৩৯৪, ছহীহুল জামে ৬৫০৫)। সুতরাং দাবা ও তার আনুসঙ্গিক খেলা যেমন তাশ, পাশা, ফ্লাশ ইত্যাদি সম্বন্ধে অবশ্যই শরী'আতের আদেশ মেনে চলতে হবে।

প্রশ্নঃ তাস খেলা ও দাবা খেলার বিধান কী? তাস খেলা ও দাবা খেলা যদি খেলোয়াড়কে নামায থেকে গাফেল বা বিরত না রাখে তাহ'লে কি তা খেলা জায়েয হবে?

উত্তরঃ তাস খেলা, দাবা খেলা এবং এধরনের আরো অন্যান্য খেলা সবই না জায়েয । কেননা এধরনের খেলা সবই অনর্থক সময় নষ্ট করার হাতিয়ার। কেননা এ সমস্ত খেলা আল্লাহর যিকির-আযকার হ'তে, যথা সময়ে নামায পড়া হ'তে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে । এবং অনর্থক সময় নষ্ট করতে বাধ্য করে। এ ছাড়া এ সমস্ত খেলা অনেক সময় পারস্পরিক শত্রুতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর যদি এ সমস্ত খেলা অর্থের বিনিময়ে অর্থাৎ হার-জিত হিসাবে খেলা হয়, তাহ'লে এ সমস্ত খেলা খুব বড় ধরনের হারাম কাজে পরিণত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রশ্নঃ সাধারণতঃ শ্রমিকেরা এবং পুলিশেরা সামনের দিকে কিছুটা লম্বা যে টুপি মাথায় ব্যবহার করে- এই টুপি বর্তমান অনেক যুবকদেরকে এবং ছোট ছেলেদেরকেও মাথায় ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে। অনেকেই বলেন কাফেরদের পোশাকের সাথে সাদৃশ্য হওয়ার কারণে এ টুপি মুসলমানদের ব্যবহার করা

জায়েয নয়। এক্ষণে প্রশ্ন হলোঃ উক্ত টুপি ব্যবহারের সঠিক বিধান কী?

উত্তরঃ উল্লিখিত টুপি যদি সত্যিকার অর্থে কাফেদের পোশাকের মধ্যে গণ্য হয়- তাহ'লে তা মুসলমানদের জন্য ব্যবহার করা হারাম। কেননা জনাব রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি (মুসলিম কওম ছাড়া) অন্য কোন কওম বা জাতির সাথে সাদৃশ্য কায়েম করল, সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে। (এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রাহিঃ) হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে ভাল কাজ করার এবং সকল প্রকার খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার পূর্ণ তাওফীক্ব দান করুন, আমীন।

৭০. কোন মু'মিনকে অভিশাপ দেওয়া এবং যে অভিশাপ পাওয়ার যোগ্য নয় তাকে অভিশাপ দেওয়া

(لَعْنُ الْمُؤْمِنِ وَلَعْنُ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ اللَّعْنَ)

('লা'নত' অর্থ 'রহমত' বা 'দয়া' থেকে দূর করে দেওয়া। আর উহার বাংলা প্রতি শব্দ হলো 'অভিশাপ'। কাউকে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করার জন্য তার উপর বদ দু'আ করাকে এক কথায় 'লা'নত' বলা হয়। আর এ কারণেই অহেতুক কারোর উপর লা'নত করা মারাত্মক অপরাধ ও হারাম)।

অনেকেই রাগের সময় জিহ্বাকে সংযত রাখতে পারে না। ফলে রাগান্বিত অবস্থায় অনেকেই সামান্য কারণেই অন্যের প্রতি লা'নত করে বসে। তাদের লা'নতের কোন ঠিক-ঠিকানা বা আগা-মাথা নেই। মানুষ, পশু, জড় পদার্থ, দিন ও সময় এমনকি নিজের সন্তান-সন্ততিকেও তারা লা'নত করে বসে। অনেক সময় দেখা যায় স্বামী তার নিজ স্ত্রীকে লা'নত করে, আবার স্ত্রীও স্বামীকে লা'নত করে। এটা একটা বড় ধরনের অন্যায় আর বড় ধরনের বদ অভ্যাস। এই লা'নতের ভয়াবহতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম) বলেছেন, "وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ"

অর্থঃ "যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে লা'নত করল, সে যেন তার প্রতি হত্যার ন্যায় কোন কাজ করে বসল" (বুখারী, ফাতহুল বারী ১০/৪৬৫)।

সাধারণতঃ মহিলাদেরকে বেশী বেশী লা'নত করতে দেখা যায়। এ জন্যে নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিলাদের জাহান্নামী হওয়ার বিভিন্ন কারণের মধ্যে এটাকে একটা অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া লা'নতকারীরা ক্বিয়ামত দিবসে অন্য কারো জন্যে সুপারিশকারী হ'তে পারবে না। আর সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার এই যে, যদি কেউ কারোর উপর অন্যায়ভাবে লা'নত করে তাহলে সেই লা'নত লা'নতকারীর উপর ফিরে আসে। তাতে লা'নতকারী মূলতঃ নিজেকেই আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করার জন্য প্রার্থনাকারী হয়ে দাঁড়াল। অতএব ইসলামী শরী'আত যে সমস্ত ক্ষেত্রে এই ঘৃণিত লা'নত করার সুযোগ দিয়েছে শুধুমাত্র সেই সমস্ত ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোন অবস্থাতেই কারোর প্রতি এই লা'নত করা মোটেই জায়েয নয়।

৭১. বিলাপ ও মাতম করা (النِّيَاحَةُ)

অনেক মহিলা আছে যারা চিল্লিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদে, মৃত ব্যক্তির গুণাবলী উল্লেখ করে মাতম করে, নিজের গালে-মুখে থাপ্পড় মারে। এগুলি বড় অন্যায়। অনুরূপভাবে শরীরের জামা ছিঁড়ে, চুল উপড়িয়ে, চুল টেনে ধরে এবং চুল কেটে বিভিন্নভাবে বিলাপ করাও বড় অন্যায়। এতে আল্লাহর ফায়ছালার প্রতি অসন্তোষ ও বিপদে অধৈর্য্যের পরিচয় দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি এমন কাজ করে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার প্রতি লা'নত করেছেন। এ সম্পর্কে আবূ-উমামা (রাঃ) বলেন,

"أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُوْرِ"

অর্থঃ "রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুখমণ্ডল ক্ষত-বিক্ষতকারিণী, পকেট বা জামা ফাড়নেওয়ালী এবং দুর্ভোগ ও ধ্বংস প্রার্থনাকারিণীর উপর লা'নত করেছেন" (ইবনু মাজাহ ১/৫০৫, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৫০৬৮)। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেছেন,

"لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ"

অর্থঃ "যে গণ্ডদেশে থাপ্পড় মারে, পকেট ছিঁড়ে ফেলে ও জাহেলিয়াতের রীতি-নীতির প্রতি আহবান জানায় সে আমাদের সমাজভুক্ত নয়" (বুখারী, ফাতহুল বারী ৩/১৬৩)। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেছেন,

"النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَ دِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ"

অর্থঃ "মাতমকারিণী মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করলে ক্বিয়ামত দিবসে তাকে আলকাতরার পাজামা ও মরীচিকাযুক্ত বর্ম পরিহিতা অবস্থায় তোলা হবে" (মুসলিম হাদীছ নং ৯৩৪)। অতএব কারো মৃত্যু বা বিপদে বিলাপ-মাতম ও আহাজারী করা বড়ই পাপের কাজ।

৭২.মুখমণ্ডলে আঘাত করা ও দাগ দেওয়া

(ضَرْبُ الْوَجْهِ وَالْوَسْمُ فِي الْوَجْهِ)

জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ (مسلم ٣ / ١٦٧٣).

অর্থঃ "রাসূলুল্লাহ(ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুখমণ্ডলে আঘাত করতে এবং মুখমণ্ডলে দাগ দিতে নিষেধ করেছেন" (মুসলিম ৩/১৬৭৩)। মুখমণ্ডলে আঘাতের বিষয়টি কিছু মাতা-পিতা ও শিক্ষকদের থেকে বেশী দেখা যায়। তারা সন্তানদের শাসন করার জন্য হাত কিংবা অন্য কিছু দ্বারা মুখমণ্ডলে মেরে থাকে। অনেকে বাড়ীর চাকরদের সাথে এরূপ করে থাকে। এতে আল্লাহ তা'আলা যে চেহারার বদৌলতে মানুষকে মর্যাদাশালী করেছেন তাকে অমর্যাদা করার সাথে সাথে অনেক সময় মুখমণ্ডলের কোন একটি ইন্দ্রিয় অকেজো হয়ে পড়তে পারে। ফলে অনুশোচনা ছাড়াও ক্ষেত্র বিশেষে ক্বিছাছ দেওয়া লাগতে পারে।

পশুর মুখমণ্ডলে দাগ দেওয়া কাজটি পশুর মালিকদের সাথে জড়িত। তারা নিজেদের পশু চেনার ও হারিয়ে গেলে ফিরে

পাওয়ার জন্য পশুগুলির মুখে দাগ দিয়ে থাকে। এটা পরিস্কার হারাম। এতে পশুর চেহারা ক্ষত করা ছাড়াও তাকে কষ্ট দেওয়া হয়। আর কেউ যদি দাবী করে যে, এরূপ দাগ দেওয়া তাদের গোত্রের একটা রীতি এবং গোত্রের বিশেষ চিহ্ন, তা'হলে এটুকু করার অবকাশ থাকতে পারে যে, শরীরের অন্য কোথাও দাগ বা কোন চিহ্ন দিবে-মুখমণ্ডলে নয়।

৭৩. একমাত্র শার'ঈ কারণ ব্যতীত তিন দিনের ঊর্ধ্বে কোন মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা

(هَجْرُ الْمُسْلِمِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ دُوْنَ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ)

মুসলমানে মুসলমানে সম্পর্ক ছিন্ন করা শয়তানের অন্যতম চক্রান্ত। শয়তানের পথ অনুসারী অনেকেই শার'ঈ কোন কারণ ছাড়াই মুসলিম ভাইদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। নেহায়েত বস্তুগত কারণে কিংবা দুর্বল কোন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে পরস্পরের মাঝে 'ছিন্ন সম্পর্ক' যুগ যুগ ধরে চলতে থাকে। তারা কেউ একে অপরের সঙ্গে কথা না বলার শপথ করে, তার বাড়ীতে প্রবেশ না করার সিদ্ধান্ত নেয়। রাস্তায় দেখা হ'লে পাশ কেটে চলে যায়। কোন মজলিসে হাযির হ'লে তার আগে-পিছের লোকদের সাথে সালাম-মুছাফাহা করে কিন্তু তার সাথে করতে ভূল হয়ে যায়। আর ইসলামী সমাজসহ সকল প্রকার সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ ও দুর্বলতা প্রবেশের এটা একটা অন্যতম কারণ।

এর পরকালীন শাস্তি কঠিন। এ প্রসঙ্গে আবূ-হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"لاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ- فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ"

অর্থঃ " কোন মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের সাথে ৩ দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকা জায়েয নয়। কেননা যে মুসলমান কারো সাথে ৩ দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকল অতঃপর সে এ অবস্থায় মারা গেল– তাহলে এ কারণে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে" (আবূদাঊদ ৫/২১৫, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৭৬৩৫)। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেছেন,

"مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ بِسَفْكِ دَمِهِ"

অর্থঃ "যে ব্যক্তি তার ভাইকে ১ বৎসর কাল পরিত্যাগ করে থাকে সে তার রক্তপাতকারী তুল্য" (বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ হাদীছ নং ৪০৬, ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৬৫৫৭)।

মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণাম এতই মারাত্মক যে, তার ফলে আল্লাহর ক্ষমা হ'তে বঞ্চিত হ'তে হয়। আবূ-হুরায়রা (রাঃ) এ প্রসঙ্গে নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে নিম্নোক্ত হাদীছ বর্ণনা করেছেন,

"تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ – فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلاَّ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ- فَيُقَالُ اُتْرُكُوْا أَوْ اُرْكُوْا (يَعْنِي أَخِّرُوْا) هٰذَيْنِ حَتَّى يَفِيْئَا"

অর্থঃ "প্রতি সপ্তাহে বান্দার আমল আল্লাহর সমীপে ২ বার করে পেশ করা হয়। সোমবারে ১ বার ও বৃহস্পতিবারে ১ বার।

তখন সকল বিশ্বাসী বান্দাকেই ক্ষমা করা হয়, কেবল সেই লোককেই ক্ষমা করা হয়না– যার সাথে তার ভাইয়ের শত্রুতা আছে। তাদের ২ জন সম্পর্কে বলা হয়, "এ ২ জন কে বাদ রাখ কিংবা অবকাশ দাও, যে পর্যন্ত না তারা ২ জন আল্লাহর পথে ফিরে আসে"(মুসলিম ৪/১৯৮৮)। অর্থাৎ শত্রুতা পরিহার না করা পর্যন্ত তাদেরকে ক্ষমা করা হয়না। **পরস্পর বিবাদকারী** বা গণ্ডগোলকারীদ্বয়ের মধ্য হ'তে যে তওবা করতে চায়– তার তওবাহ করার পরে তার সঙ্গীর নিকটে যেয়ে সাক্ষাত করা ও সালাম দেওয়া একান্ত যরুরী। যদি সে তা করে কিন্তু তার সঙ্গী যদি তার সাথে সাক্ষাত বা কথাই না বলে কিংবা সালামের জবাবও না দেয়, তাহলে সে অর্থাৎ প্রথম ব্যক্তি দোষমুক্ত হয়ে যাবে। আর দণ্ড বা পাপ যা কিছু হওয়ার তার সবই ঐ অস্বীকারকারী বা দ্বিতীয় ব্যক্তির উপরে পতিত হবে।

আবূ-আইয়ুব আনছারী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন,

لاَيَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَ يُعْرِضُ هٰذَا وَ خَيْرُهُمَا الَّذِيْ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ (بخاري، فتح الباري ٤٩٢/١٠)

অর্থঃ "কোন ব্যক্তির জন্য তার ভাইয়ের সাথে ৩ দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকা জায়েয নয়। সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার আলামত হলো, তাদের দু'জনের মাঝে সাক্ষাত হ'লে দু'জনই একে অপরের সাথে কথা না বলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের দু'জনের মধ্যে সেই উত্তম হবে, যে প্রথমে তার সঙ্গীকে সালাম দিবে।" (বুখারী, ফাতহুল বারী ১০/৪৯২)